محمد ﷺ خاتم النبيين - بنغالي

মুহাম্মাদ শেষ নবী

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالزلفي

42 هاتف: ٠١٦ ٤٢٣٤٤٦٦ .فاكس: ٠١٦ ٤٢٣٤٤٧٧

جمعية الدعوة بالزلفي

মুহাম্মাদ ﷺ শেষ নবী

محمد ﷺ خاتم النبيين – اللغة البنغالية

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في الزلفي
Tel: 966 164234466 - Fax: 966 164234477

محمد ﷺ خاتم النبيين

أعده وترجمه إلى اللغة البنغالية:

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالزلفي

الطبعة الرابعة: ١٤٤٢/١١ هـ

ح شعبة توعية الجاليات بالزلفي، ١٤١٧هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

شعبة توعية الجاليات (بالزلفي)

محمد ﷺ خاتم النبيين / شعبة توعية الجاليات بالزلفي ١٤١٧

٥٧ ص؛ ١٢ × ١٧ سم

ردمك: ٧-٣٤-٨١٣-٩٩٦٠

(النص باللغة البنغالية)

١-السيرة النبوية أ. العنوان

ديوي ٢٣٩ ١٤١٧/٣١٣٣

رقم الإيداع: ١٤١٧/٣١٣٣

ردمك: ٧-٣٤-٨١٣-٩٩٦٠

محمد ﷺ خاتم النبيين
মুহাম্মাদ ﷺ শেষ নবী

নবী আগমনের পূর্বে আরবের অবস্থা

মূর্তি পূজাই ছিল আরবদের প্রচলিত ধর্ম. সত্য ধর্মের পরিপন্থী এ ধরনের মূর্তিপূজাবাদ অবলম্বন করার কারণে তাদের এ যুগকে আই- য়্যামে জাহেলিয়াত তথা মূর্খতার যুগ বলা হয়. লাত, উযযা, মানাত ও হুবল ছিল তাদের প্রসিদ্ধ উপাস্যগুলোর অন্যতম. আরবের কিছু লোক ইয়াহুদী, খ্রীষ্টান ও অগ্নি পূজকদের ধর্মও গ্রহণ করেছিল. আবার স্বল্প সংখ্যক লোক এমনও ছিল, যারা ইবরাহীম عليه السلام-এর প্রদর্শিত পথে ছিল অবিচল, আঁকড়ে ধরেছিল তাঁর আদর্শ.

অর্থনৈতিক দিক দিয়ে বেদুঈনরা সম্পূর্ণ ভাবে চরে খাওয়া পশু সম্পদের উপর নির্ভর করতো. আর নগরবাসীদের নিকট অর্থনৈতিক জীবনের ভিত্তি ছিল কৃষিকাজ ও ব্যবসা-বাণিজ্য. ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে আরব দেশের মক্কাই ছিল বৃহত্তর বাণিজ্য নগরী. অন্যান্য বিভিন্ন অঞ্চলেও উন্নয়ন ও স্থাপত্য সভ্যতা ছিল. সামাজিক দিক দিয়ে যুলুম চরমপর্যায়ে সর্বত্র বিরাজমান ছিল. তাদের সেখানে দুর্বলের ছিল না কোন অধিকার. কন্যা সন্তানকে জীবদ্দশায় দাফন করা হতো. মান-ইজ্জত ও সম্মানকে করা হতো পদদলিত. সবল দুর্বলের অধিকার হরণ করতো. বহুবিবাহ প্রথার

কোন সীমা ছিল না. ব্যভিচার অবাধ ভাবে চলতো. নগণ্য ও তুচ্ছ কারণে যুদ্ধের অগ্নিশিখা জ্বলে উঠতো. সংক্ষেপে বলতে গেলে বলা যায় যে,ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে আরব দ্বীপের সার্বিক পরিস্থিতি অত্যধিক ভয়াবহই ছিল.

ইবনুযযাবিহাঈন

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দাদা আব্দুল মুত্তালিবের সাথে কুরাইশরা ছেলে-সন্তান ও সম্পদের গৌরব ও অহংকার প্রদর্শন করতো. তাই তিনি মানত করলেন যে, আল্লাহ যদি তাঁকে দশজন ছেলে দান করেন, তাহলে তিনি একজনকে কথিত খোদার নৈকট্য প্রাপ্তির লক্ষ্যে জবাই করবেন. তাঁর সাধ বাস্তব রূপ পেল. দশ জন ছেলে জুটলো তাঁর ভাগ্যে. তাদের একজন ছিলেন নবীর পিতা আব্দুল্লাহ. আব্দুল মুত্তালিব মানত পূরণ করার ইচ্ছায় সন্তানদের মধ্যে লটারী করলে তাতে আব্দুল্লাহর নাম বের হলো. তিনি তাকে জবাই করতে চাইলে লোকজন তাঁকে বাধা দিল, যাতে এটা মানুষের মধ্যে প্রথা না হয়ে যায়. অতঃপর সবাই আব্দুল্লাহ এবং দশটি উঁটের মধ্যে লটারী করতে সম্মত হয়. কিন্তু লটারীতে আব্দুল্লাহর নাম আসে, ফলে উঁটের সংখ্যা দ্বিগুণ বৃদ্ধি করা হয়. এইভাবে লটারী বারংবার আব্দুল্লাহর নামে আসতে থাকে. দশমবারে লটারী উঁটের নামে আসে যখন তার সংখ্যা ১০০ তে দাঁড়ায়. ফলে তিনি তাঁর ছেলে আব্দুল্লাহর পরিবর্তে উঁট জবাই করেন.

আব্দুল্লাহ তাঁর পিতা আব্দুল মুত্তালিবের সব চাইতে প্রিয় ছেলে ছিলেন. বিশেষতঃ এই ঘটনার পর. আব্দুল্লাহ তারুণ্যের সীমায় পা

রাখলে, তাঁর পিতা বনী যোহরা গোত্রের আমেনা বিনতে ওয়াহাব নামক এক তরুণীর সাথে তাঁর বিয়ের ব্যবস্থা করেন. আমেনা অন্তঃসত্ত্বা হলেন. তাঁর অন্তঃসত্ত্বা হবার তিন মাস পর আব্দুল্লাহ এক বাণিজ্যিক কাফেলার সাথে সিরিয়ার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হোন.কিন্তু প্রত্যাবর্তনের পথে রোগাক্রান্ত হয়ে মদীনায় বনীনাজ্জার গোত্রে তাঁর মামাদের কাছে অবস্থান করেন এবং সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়. তাঁকে সমাধিস্থ করা হয় সেখানে.

এদিকে গর্ভের মাসগুলো পুরো হয়ে প্রসবের সময় ঘনিয়ে আসলো এবং সোমবারের দিন নবী করীম ﷺ জন্ম গ্রহণ করলেন. তবে তাঁর জন্মের তারীখ ও মাস দৃঢ়তার সাথে নির্দিষ্ট নয়. বরং কেউ বলেছে, তিনি ৯ই রাবিউল আওয়াল জন্ম গ্রহণ করেছেন. কেউ বলেছে, ১২ই রাবিউল আওয়াল এবং কেউ বলেছে, রমযান মাসে. এ ছাড়া আরো উক্তিও আছে. আর এই ঐতিহাসিক ঘটনা সংঘটিত হয় ইংরাজী সনের ৫৭১ খ্রীষ্টাব্দে. এই বছরটা 'আমুল ফীল' (হস্তি বাহিনীর বছর) নামে পরিচিত.

হস্তী বাহিনীর ঘটনা

আবরাহা ছিল ইথিওপিয়ার শাসক কর্তৃক নিযুক্ত ইয়ামানের গভর্নর. সে যখন দেখলো যে, আরবরা মক্কায় অবস্থিত কা'বার হজ্জ করছে, তার তাযীম করছে এবং দূর-দুরান্ত থেকে সেখানে আগমন করছে, তখন সে সানআতে (বর্তমানে ইয়ামানের রাজধানী) এক বিরাট গির্জা নির্মাণ করলো, যেন আরবরা এ নব নির্মিত গির্জায় হজ্জ করে. অতঃপর কেনানা গোত্রের (আরবের

একটা গোত্র) এক লোক তা শুনার পর রাতে প্রবেশ করে, গির্জার দেয়ালগুলোকে মলদ্বারা পঙ্কিল করে দেয়. আবরাহা এ কথা শুনার পর রাগে ক্ষেপে উঠলো এবং ৬০হাজারের এক বিরাট সেনা বাহিনী নিয়ে কাবাশরীফ ধ্বংস করার জন্য রওয়ানা হলো. সেনাবাহিনীর মধ্যে নয়টি হাতী ছিল. নিজের জন্য সে সব চেয়ে বড় হাতীটা পছন্দ করলো. মক্কা নিকটবর্তী হওয়া পর্যন্ত তারা যাত্রা অব্যাহত রাখলো. তারপর সেনাবাহিনীকে প্রস্তুত করে মক্কায় প্রবেশ করার জন্য উদ্যত হলো, কিন্তু হাতী বসে গেল কোনক্রমেই কাবার দিকে অগ্রসর করানো গেলো না. যখন তারা হাতীকে কাবার বিপরীত দিকে অগ্রসর করাতো, দ্রুত সে দিকে অগ্রসর হতো কিন্তু কাবার দিকে অগ্রসর করাতে চাইলেই, বসে পড়তো. এমতাবস্থায় আল্লাহ তাদের প্রতি প্রেরণ করেন ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি, যা তাদের উপর জাহান্নামের আগুনে পক্ত করা ছোট ছোট পাথরের টুকরো নিক্ষেপ করা শুরু করলো. প্রত্যেক পাখি তিনটি করে কাঁকর বহন করে এনেছিলো. ১টি পাথর ঠোঁটে আর দুটি দুই পায়ে. পাথর দেহে পড়া মাত্র দেহের সব অঙ্গ-প্রতঙ্গ টুকরো টুকরো হয়ে ধ্বংস হয়ে যেতো. যারা পলায়ন করে, তারাও পথে মৃত্যুর ছোবল থেকে রক্ষা পায়নি.

আবরাহার উপর মহান আল্লাহ এমন মারাত্মক এক রোগ প্রেরণ করলেন যে, সে রোগের ফলে তার সব আঙ্গুল খসে পড়তে লাগলো এবং সে এমন অবস্থায় সানআয় পৌঁছলো যে, কষ্ট তার শেষ সীমা পর্যন্ত তাকে গ্রাস করে ফেলেছিলো. সে সেখানে মৃত্যুবরণ করলো. কুরাইশরা গিরিউপত্যকায় বিক্ষিপ্ত হয়ে গিয়েছিল এবং সেনাবাহিনীর ভয়ে পর্বতে আশ্রয় নিয়েছিল. আবরাহার

সেনাবাহিনীর এ অশুভ পরিণামের পর তারা নিরাপদে ঘরে ফিরে আসলো. রাসূলে করীম ﷺ-এর জন্মের ৫০দিন পূর্বে এ ঘটনা সংঘটিত হয়েছিলো.

দুধ পান

নবী করীম ﷺ-এর জন্মের পর প্রথমে তাঁকে দুধ পান করায় তাঁর চাচা আবূ লাহাবের ক্রীতদাসী সুআইবা. এই মহিলা ইতিপূর্বে তাঁর (রাসূলের) চাচা হামযা ইবনে আব্দুল মুত্তালিবকেও দুধ পান করিয়ে ছিলো. তাই হামযা ﷺ ছিলেন নবী করীম ﷺ-এর দুধ ভাই. আরবদের প্রথা ছিল যে, তারা তাদের শিশুদেরকে বেদুঈন অধ্যুষিত মরু অঞ্চলে লালন-পালন করার উদ্দেশ্যে পাঠিয়ে দিত. সেখানে তাদের দৈহিক সুস্থতার অনুকূল পরিবেশ ছিল. তাই রাসূলুল্লাহ ﷺও অন্য দুধদাত্রীর কাছে স্থানান্তরিত হলেন. রাসূলে করীম ﷺ-এর পবিত্র জন্ম লাভের পর বনীসাদ গোত্রের এক মহিলার দল দুধপানকারী সন্তানের খোঁজে মক্কায় আসে. মহিলারা মক্কার ঘরে ঘরে শিশুর অনুসন্ধানে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়. কিন্তু রাসূলের পিতৃহীনতা ও দারিদ্র্যের কারণে সকল মহিলারা মুহাম্মাদ ﷺকে গ্রহণ করা থেকে ছিলো বিমুখ. হালিমা সাদিয়াও ছিলেন মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) থেকে বিমুখ প্রদর্শন- কারিণী মহিলাদের মধ্যে একজন. সবার মত তিনিও ছিলেন বিমুখ. শিশু পালনের পারিশ্রমিক দিয়ে জীবনের অভাব অনটন বিমোচন করা ও জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতা দূর করার লক্ষ্যে মক্কার অধিকাংশ ঘরে শিশুর অনুসন্ধান করেও সফল হোননি তিনি. অধিকন্তু সে বছরে ছিল অনাবৃষ্টি ও দুর্ভিক্ষ. তাই স্বল্প পারিশ্রমিকে ইয়াতীম সন্তানকে নেয়ার উদ্দেশ্যে

আমেনার ঘরে আবার ফিরে আসেন তিনি. হালিমা আপন স্বামীর সাথে মক্কায় মন্থর গতিতে চলে এমন একটি দুর্বল গাধী নিয়ে এসেছিলেন. কিন্তু প্রত্যাবর্তনের পথে রাসূলুল্লাহ ﷺকে কোলে নেয়ার পর গাধী অত্যন্ত দ্রুত গতিতে চলছিলো এবং অন্যান্য সব জানোয়ারকে পিছনে ফেলে আসছিল. ফলে সফর সঙ্গীরা অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হয়. হালিমা আরো বর্ণনা করেন যে, তাঁর স্তনে কোন দুধ ছিল না, তাঁর ছেলে ক্ষুধায় সর্বদা কাঁদতো. রাসূলে করীম ﷺ তাঁর পবিত্র মুখ স্তনে রাখার পর প্রচুর পরিমাণে দুধ তাঁর স্তনে আসতে লাগলো. বনী সাদ গোত্রের অধ্যুষিত অঞ্চলের অনাবৃষ্টি সম্পর্কে তিনি বলেন যে, এ শিশু (মুহাম্মদ ﷺ) দুধ পান করার বদৌলতে জমিতে উৎপন্ন হতে লাগলো ফল-মূল এবং ছাগল ও অন্যান্য পশু দিতে লাগলো বাচ্চা. অবস্থা সম্পূর্ণ পাল্টে যায়. দারিদ্র্য ও অভাব-অনটনের পরিবর্তে সুখ ও সমৃদ্ধি সর্বত্র বিস্তার লাভ করে.

মুহাম্মাদ ﷺ হালিমার পরিচর্যায় দু'বছর লালিত পালিত হোন. তিনি তাঁর প্রতি সর্বতোভাবে যত্নশীলা ছিলেন. এই শিশুকে কেন্দ্র করে হৃদয়ের গভীরে তিনি বহু অলৌকিক কর্ম-কান্ড ও অবস্থা উপলব্ধি করতেন. দু'বছর শেষ হবার পর হালিমা তাঁকে মক্কায় মাতা ও দাদার কাছে নিয়ে আসলেন. কিন্তু তিনি যেহেতু রাসূলে করীম ﷺ-এর বদৌলতে বহু এমন এমন বরকত অবলোকন করেন, যে বরকত তাঁর অবস্থার পরিবর্তন ঘটায়, তাই আমেনার কাছে রাসূলে করীম ﷺকে দ্বিতীয় বার দেয়ার জন্য আবেদন করেন. আমেনা তাতে সম্মত হোন. হালিমা ইয়াতীম শিশুকে নিয়ে নিজ এলাকায় আনন্দ ও সন্তোষ সহকারে ফিরে আসেন.

বক্ষ বিদারণ

এক দিন শিশু মুহাম্মাদ তাঁর দুধভাইয়ের (হালিমার ছেলের) সাথে তাঁবু থেকে দূরে খেলা-ধুলা করছিলেন. এ সময় তাঁর বয়স ছিল চার বছরের কাছা কাছি. এমতাবস্থায় হালিমার ছেলে ভীত সন্ত্রস্ত ও আতং- কগ্রস্ত হয়ে মায়ের কাছে দৌড়ে এসে তাকে কুরাইশী ভাইয়ের সাহায্যে এগিয়ে আসার অনুরোধ জানালো. ঘটনা কি জিজ্ঞেস করা হলে সে উত্তর দিলো যে, দু'জন সাদা পোশাক পরিহিত লোককে আমাদের কাছ থেকে মুহাম্মাদকে নিয়ে মাটিতে চিৎ ক'রে তাঁর বক্ষ বিদীর্ণ করতে দেখেছি. তার বর্ণনা শেষ না করতেই হালিমা ঘটনাস্থলের দিকে দৌড়ে যান.

গিয়ে দেখেন মুহাম্মাদ নিজ স্থানে স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে আছেন.হলুদ বর্ণ মুখমন্ডলে ভেসে গেছে. দেহ ফ্যাকাশে. তাঁকে ঘটনা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে অত্যন্ত শান্তভাবে জবাব দেন যে, তিনি ভাল আছেন. তিনি আরো বলেন,সাদা পোশাক পরিহিত দু'ব্যক্তি এসে তাঁর বক্ষবিদীর্ণ করে হৃদয় বের ক'রে কাল জমাট বাঁধা রক্ত বের ক'রে ফেলে দেয়. অতঃপর এবং হৃদয়কে ঠান্ডা পানি দিয়ে ধুয়ে আবার যথাস্থানে রেখে দেয়. বক্ষে হাত ফিরিয়ে দৃষ্টির অন্তরালে চলে যায়. এর পর হালিমা মুহাম্মাদকে নিয়ে তাঁবুতে ফিরে আসেন. পরের দিন ভোর হতেই তিনি মুহাম্মাদকে তাঁর মায়ের কাছে মক্কায় নিয়ে আসেন. আমেনা অনির্ধারিত সময়ে হালিমাকে ছেলে নিয়ে আসতে দেখে আশ্চর্যান্বিত হোন, অথচ তিনি ছেলের (নিজের কাছে রাখার) প্রতি ছিলেন অত্যধিক আগ্রহী. কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে হালিমা বক্ষ বিদারণের ঘটনার পুরো বিবরণ দেন.

আমেনা নিজের ইয়াতীম শিশু মুহাম্মাদকে নিয়ে ইয়াসরাবে (মদীনায়) বনী নাজ্জার গোত্রে মামাদের সাথে মিলিত হওয়ার জন্য যাত্রা করেন. সেখানে কিছু দিন অবস্থান ক'রে ফেরার পথে "আবওয়া" নামক স্থানে মৃত্যু বরণ করেন এবং সেখানেই তাঁকে দাফন করা হয়. ফলে মুহাম্মাদ ছয় বছর বয়সে মাতৃ-স্নেহ ও আদরের ছায়া থেকে বঞ্চিত হোন. দাদা আব্দুল মুত্তালিবকে এ অপূরণীয় ক্ষতির কিছুটা লাঘব করতে হবে. তাই তিনি তাঁর দেখা-শুনা ও পরিচর্যার দায়িত্ব নেন. রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন আট বছর বয়সে পা রাখেন, তখন তাঁর দাদা ইহকাল ত্যাগ করেন. অতঃপর চাচা আবূ তালিব আর্থিক অভাব-অনটন ও পরিবারের সদস্য সংখ্যা বেশী থাকা সত্ত্বেও তাঁর দেখা-শুনার দায়িত্ব নেন. রাসূলে করীম ﷺ-এর চাচা আবূ তালেব ও তার স্ত্রী তাঁর (রাসুলের) সাথে আপন ছেলের ন্যায় আচরণ করেন. ইয়াতীম ছেলের সম্পর্ক আপন চাচার সাথে অনেকটা গভীর হয়ে উঠে. এ পরিবেশে তিনি বড় হয়ে উঠেন. সত্যবাদিতা ও আমানতদারীর মত গুণে গুণান্বিত হয়ে যৌবনে পদার্পন করেন. এমন কি উক্ত গুণ দু'টি তাঁর পরিচায়ক উপাধিরূপে প্রসিদ্ধ লাভ করে. সুতরাং কেউ যদি বলে, আল-আমীন উপস্থিত হয়েছেন, বুঝা হতো মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)

রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন কিছুটা বড় হয়ে যৌবনে পদার্পণ করেন, তখন স্বনির্ভরতা অর্জনের লক্ষ্যে জীবিকার্জনের চেষ্টা করেন. ফলে শ্রম ব্যয় ও উপার্জনের পালা আরম্ভ হয়. তিনি স্বল্প পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কুরাইশের কিছু লোকের ছাগলের রাখাল হিসেবে কাজ

করেন. খাদীজা বিনতে খোয়াইলিদ কর্তৃক আয়োজিত এক বাণিজ্যিক ভ্রমণে সিরিয়া গমন করেন. খাদীজা ছিলেন বিত্তশালিনী বিধবা মহিলা. সে ভ্রমণে সম্পদ ও ব্যবসায়িক সামগ্রীর তত্ত্বাবধায়ক ছিল তাঁরই দাস 'মাইসারাহ'. রাসূলে করীম ﷺ-এর বরকত ও সততার কারণে খাদীজার এ ব্যবসায়ে নজীরবিহীন লাভ হয়. তিনি স্বীয় দাস মাইসারাহর কাছে এত লাভ হওয়ার কারণ কি জানতে চাইলে বলা হয়, মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ নিজেই বেচা-কেনার দায়িত্ব নিয়ে ছিলেন. ক্রেতার ঢল নামে. ফলে কারো প্রতি কোন যুলুম করা ব্যতিরেকেই লাভ হয় প্রচুর. খাদীজা তাঁর দাসের বর্ণনা মনোযোগ দিয়ে শুনেন. এমনিতেও তিনি মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) সম্পর্কে অনেক কিছু জানতেন. তিনি মুহাম্মাদের প্রতি হয়ে পড়েন মুগ্ধ ও অভিভূত. তিনি তাঁকে বিবাহ করতে আগ্রহী হোন. তাই এ ব্যাপারে মুহাম্মাদের মনোভাব জানার উদ্দেশ্যে নিজের এক আত্মীয়াকে পাঠান. তখন তাঁর বয়স পঁচিশে উন্নীত হয়. তাঁর নিকট খাদীজার আত্মীয়া বিয়ের প্রস্তাব রাখলে তিনি তা গ্রহণ করেন. বিয়ে সম্পাদিত হয়. তাঁরা একে অপরকে পেয়ে সুখী হোন. তিনি খাদীজার অর্থ সম্পদ ও ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনায় স্বীয় যোগ্যতা ও দক্ষতার প্রমাণ দেন. কয়েক বছর অতিবাহিত হয়. খাদীজা গর্ভধারণ ও প্রসব করেন. ফলে খাদীজার গর্ভে জন্ম লাভ করেন কন্যাদের মধ্যে যয়নাব, রুকাইয়্যাহ, উম্মেকুলসুম ও ফাতিমা. আর ছেলেদের মধ্যে কাসিম ও আব্দুল্লাহ, যারা শৈশবেই মারা যান.

কা'বা গৃহ পুনঃ নির্মাণ

যখন নবী করীম ﷺ-এর বয়স ছিল পঁয়ত্রিশ বছর ঠিক এ সময় কুরা- ইশরা কা'বা গৃহ পুনঃ নির্মাণের ইচ্ছা করে. কারণ, তার দেওয়ালগুলো ফেটে গিয়েছিল এবং অনেক পূর্বে নির্মিত হওয়ার কারণে তা ভেঙ্গে পড়ার মত অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল. তাছাড়া মহা এক প্লাবন মক্কাকে গ্রাস করার কারণে এবং কা'বামুখী জলধারা প্রবল বেগে প্রবাহিত হওয়ার কারণে কা'বার চরম অবনতি ঘটেছিলো. ফলে কুরাইশরা কা'বার মান-মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখার তাগিদে তার পুনঃ নির্মাণ করতে বাধ্য হয়ে পড়েছিলো. আর তারা সকলে মিলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো যে, তার নির্মাণে কেবল হালাল ও পবিত্র অর্থই ব্যবহার করা হবে. এই নির্মাণ কাজ যখন 'হাজরে আসওয়াদ' পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছল, তখন তাদের মধ্যে এ নিয়ে ঝগড়ার সৃষ্টি হলো যে, ঐ পাথরকে তার যথাস্থানে রাখার গৌরব লাভে কে বা কারা ধন্য হবে. চার অথবা পাঁচ দিন পর্যন্ত এ বিবাদ অব্যাহত থাকলো. আর এ বিবাদ কঠিনতর হয়ে তাদের মধ্যে ধ্বংসকারী এক যুদ্ধ বেঁধে যাওয়ার পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছে গিয়েছিলো. অতঃপর তারা ঐক্যবদ্ধ হলো যে, তারা তারই মীমাংসাকে মেনে নিবে, যে (আগামী কাল) সর্ব প্রথম মসজিদে প্রবেশ করবে. এ দিকে আল্লাহ চাইলেন যে, সর্ব প্রথম প্রবেশকারী রাসূলুল্লাহ ﷺ হোক. তারা যখন তাঁকে দেখলো, তখন সকলে চিৎকার করে বলে উঠলো যে, ইনি তো 'আল আমীন' (বিশ্বাসী). আমরা সকলে তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট. ইনি হলেন মুহাম্মাদ ﷺ. তিনি তাদের কাছে পৌঁছলে বিস্তারিত ঘটনা তাঁকে জানানো হলো. তিনি একটি চাদর চাইলেন

এবং 'হাজরে আসওয়াদ' কে তার মধ্যেখানে রেখে দিলেন. অতঃপর বিবাদকারী গোত্রের সর্দারদেরকে বললেন, আপনারা চাদরের একটি করে কোণা ধরে সেটাকে উঠিয়ে নিয়ে চলুন. যখন তারা সেটাকে নিয়ে যথাস্থানে পৌঁছলো, তখন তিনি ﷺ সেটা (পাথরটা)কে সহস্তে উঠিয়ে যথাস্থানে রেখে দিলেন. এটা ছিলো এক সুবিজ্ঞ মীমাংসা যাতে সকলেই সন্তুষ্ট হয়েছিলো.

এদিকে কুরাইশদের বৈধ অর্থ কমে গেলো, তাই উত্তর দিক থেকে কা'বা গৃহের দৈর্ঘ প্রায় ছয় হাত পর্যন্ত কমিয়ে দেওয়া হলো. আর এই অংশটুকুকেই বলা হয় 'হিজ্‌র' এবং 'হাতীম'. কাব'ার নির্মার্ণ কার্য সম্পন্ন হলে তা প্রায় চার কোণা আকারের একটি গৃহের রূপ ধারণ করলো. তারা (কুরাইশরা) তার দরজাকে যমীন থেকে উঁচু করে দিলো, যাতে তার মধ্যে কেবল সেই ব্যক্তি প্রবেশ করতে পারে, যাকে তারা অনুমতি দিবে. যখন দেওয়ালগুলো পনের হাত উঁচু হলো, তখন ছয়টি পিলার বা স্তম্ভের উপর তার ছাদ দেওয়া হলো.

হিলফুল ফুযূল বা ন্যায়নিষ্ঠার প্রতিজ্ঞা

হিলফুল ফুযূল বা ন্যায়নিষ্ঠার প্রতিজ্ঞা হওয়ার কারণ হলো, ইয়ামা- নের যুবাইদী গোত্রের এক ব্যক্তি তার দ্রব্যাদি নিয়ে (বিক্রয়ের জন্য) মক্কায় আসে. আ'স ইবনে ওয়ায়েল তার কাছ থেকে তা ক্রয় করে নেয়. এই লোকের মক্কায় বড়ই মান-মর্যাদা ছিলো. সে তাকে তার অধিকার থেকে বঞ্চিত করলো. আর যুবাইবী গোত্রের এই লোক এমন কাউকে পেলো না যে তার থেকে তার

ন্যায্য প্রাপ্ত ও অধিকার আদায় করে দিবে. তাই সে পাহাড়ের উপরে আরোহন ক'রে তার যুলুমের প্রতিকারের জন্য ফরিয়াদ করলো. ফলে মক্কার বিভিন্ন গোত্রের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গরা একত্রিত হয় এবং তারা যুলুমের প্রতিকারের জন্য সকলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে অঙ্গীকার ব্যক্ত করে যে, মক্কার ও মক্কায় প্রবেশকারী সকল অত্যাচারিত ব্যক্তির পক্ষ নিয়ে তার যুলুমের প্রতিকার করবে. কুরাইশরা এর নাম দেয় 'হিলফুল ফুযূল'. নবী করীম ﷺ এই অঙ্গীকার গ্রহণের সভায় উপস্থিত ছিলেন. তখন তাঁর বয়স ছিলো বিশ বছর.

নবুওয়াত লাভ

তাঁর বয়স চল্লিশের নিকটবর্তী হওয়ার সাথে সাথে মক্কার সন্নিকটে পূর্বদিকে (নূর নামক) এক পাহাড়ের হেরা নামক গুহায় তিনি নিরিবিলি ও নির্জন অবস্থায় কয়েক দিন ও কয়েক রাত আল্লাহর ধ্যানে কাটিয়ে দিতেন. পবিত্র রমযানের ২১তারিখের রাতে গুহায় তাঁর কাছে জিবরীল (আঃ) আসেন. তখন তাঁর বয়স ছিল ৪০ বছর. জিবরীল বলেন, পড়ুন. তিনি বললেন, আমি পড়তে জানি না. জিবরীল দ্বিতীয়বার ও তৃতীয়- বারের মত পুনরায় বললেন. তৃতীয়বার জিবরীল বলেন,

﴿ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ، خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ، اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴾ [العلق: ١-٥]

অর্থঃ "পাঠ করুন আপনার পালনকর্তার নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন.

সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্ত থেকে. পাঠ করুন,আপনার পালন- কর্তা মহাদয়ালু, যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন. শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানতো না. (আলাক ১-৫) অতঃপর জিবরীল ﷺ চলে গেলেন. রাসূলুল্লাহ ﷺ আর হেরা গুহায় অবস্থান করতে পারলেন না.তিনি ঘরে এসে খাদীজাকে হৃদয় স্পন্দিত অবস্থায় বললেন, আমাকে বস্ত্রাচ্ছাদিত করো, আমাকে বস্ত্রাচ্ছাদিত কর. তাঁকে বস্ত্রাচ্ছাদিত করা হলো. ভয় ও আতংক দূর হয়ে গেলে তিনি সবকিছু খাদীজাকে খুলে বললেন. এর পর তিনি বললেন, আমি নিজের ব্যাপারে আশংকা বোধ করছি. খাদীজা দৃঢ়তার সাথে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, "কখনো নয়,আল্লাহর শপথ! আল্লাহ আপনাকে অপমানিত করবেন না. নিশ্চয় আপনি আত্মীয় স্বজনদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখেন, অভাবীদের সাহায্য করেন, গরীব ও নিঃস্ব ব্যক্তিদেরকে প্রদান করেন. অতিথিকে সমাদর করেন এবং বিপদগ্রস্তদের সহায়তা করেন".

কিছু দিন পরে তিনি আল্লাহর ইবাদত অব্যাহত রাখার জন্য আবার হেরা গুহায় ফিরে আসেন. ইবাদত শেষে গুহা থেকে মক্কায় প্রত্যাবর্তনের জন্য অবতরণ করছিলেন, যখন তিনি উপত্যকায় পৌঁছলেন, তখন জিবরাঈল আকাশ ও যমিনের মধ্যবর্তী স্থানে একটি চেয়ারে উপবিষ্ট অবস্থায় তাঁর কাছে এসে তাঁর প্রতি অহী করেন.

﴿ يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ، قُمْ فَأَنْذِرْ، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ﴾

[المدثر١-٥]

অর্থাৎ, "হে চাদরাবৃত! উঠুন,সতর্ক করুন,আপনার পালনকর্তার মাহাত্ম্য ঘোষণা করুন. আপনার পোশাক পবিত্র করুন এবং অপবিত্রতা দূর করুন." (সূরা মুদ্দাস্সিরঃ ১-৫) পরবর্তী সময়ে ওহী অব্যাহতথাকে.

রাসূলুল্লাহ ﷺ পবিত্র দাওয়াতী ব্রত শুরু করলে সর্ব প্রথম তাঁর গুণবতী স্ত্রী খাদীজা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) ঈমানের ডাকে সাড়া দেন. আল্লাহর একত্ববাদ ও তাঁর স্বামীর নবুওয়াতের সাক্ষ্য দেন. তাই তিনি ছিলেন সর্ব প্রথম মুসলিম নারী. অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু আবূ বাকারের সাথে ইসলামের ব্যাপারে আলাপ করলে দ্বিধাহীন চিত্তে তিনিও ইসলাম গ্রহণ করেন এবং সত্যতার সাক্ষ্য দেন. রাসূলুল্লাহ ﷺ আপন চাচা আবূ তালিবের স্নেহ পরিচর্যা ও অবদানের কৃতজ্ঞতা স্বরূপ, যিনি রাসূলের মাতা ও দাদার পর দেখা-শুনার দায়িত্ব বহন করেন, তাঁর ছেলে আলীর লালন-পালন ও দেখা-শুনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন. এ সুন্দর পরিবেশ আলীর অন্তর ও বিবেক খুলে দেয়. তিনিও ঈমান আনয়ন করেন. অতঃপর খাদীজার দাস যাইদ ইবনে হারেসাহ ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে সমবেত হোন.

রাসূলুল্লাহ ﷺ গোপন ভাবে দাওয়াতী মিশন চালিয়ে যেতে থাকলেন. নবাগত মুসলিমরা কুরাইশদের কঠিন নির্যাতনের শিকার হওয়ার ভয়ে তাঁদের ইসলাম গোপন করে রাখতেন. কারো ইসলাম গ্রহণের বিষয়টা প্রকাশ হয়ে গেলে কুরাইশরা তাঁদেরকে ইসলাম থেকে ফিরিয়ে আনার জন্য কঠিন নির্যাতন চলাতো. এই সময় সাহাবাগণ যখন নামায পড়ার ও ইবাদত করার ইচ্ছা করতেন,

তখন কুরাইশদেরকে গোপন করার জন্য মক্কার বাইরে কোন উপত্যাকায় চলে যেতেন.

প্রকাশ্য দাওয়াত

এ ভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ ৩ বছর পর্যন্ত ব্যক্তিগত দাওয়াতের গোপন ব্রতে ব্যস্ত থাকেন. অতঃপর আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশ আসে যে,

﴿ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ﴾ [الحجر:٩٤]

অর্থাৎ, "আপনি প্রকাশ্যে শুনিয়ে দেন, যা আপনাকে আদেশ করা হয় এবং মুশরিকদের পরোয়া করবেন না." (সূরা হিজ্‌রঃ৯৪) এ আদেশ পেয়ে এক দিন তিনি সাফা পর্বতে আরোহণ ক'রে কুরাইশ- দেরকে ডাক দেন. তাঁর ডাক শুনে অনেক লোকের সমাগম ঘটে. তন্মধ্যে তাঁর চাচা আবু লাহাবও একজন ছিল. সে কুরাইশদের মধ্যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সব চাইতে কট্টর শত্রু ছিল. মানুষ সমবেত হবার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন,আমি যদি আপনাদেরকে এ কথার সংবাদ দিই যে, পাহাড়ের পেছনে এক শত্রুদল আপনাদের উপর আক্রমণ করার জন্য অপেক্ষা করছে.আপনারা আমার কথা বিশ্বাস করবেন? সবাই এক স্বরে বললো, আমরা আপনার মধ্যে সততা ও সত্যবাদিতা ছাড়া কিছুই দেখিনি. তিনি বললেন, আমি আপনাদেরকে কঠিন শাস্তির ব্যাপারে সতর্ক করছি. অতঃপর তিনি তাদেরকে আল্লাহর পথে আহ্বান করলেন এবং মূর্তিপূজা বর্জন করতে বললেন. একথা শুনে আবুলাহাব রাগে ক্ষেপে উঠে বললো, তোমার ধ্বংস হোক. এ জন্যেই

কি আমাদেরকে একত্রিত করেছো? এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ পাক সূরা লাহাব অবতীর্ণ করেন.

﴿ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ، مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ، سَيَصْلَى نَاراً ذَاتَ لَهَبٍ، وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الحَطَبِ، فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ ﴾ [المسد]

অর্থাৎ, "আবূ লাহাবের হস্তদ্বয় ধ্বংস হোক এবং ধ্বংস হোক সে নিজে. কোন কাজে আসেনি তার ধন-সম্পদ ও যা সে উপার্জন করেছে. সত্বর সে প্রবেশ করবে লেলিহান অগ্নিতে এবং তার স্ত্রীও যে ইন্ধন বহন করে. তার গলদেশে খর্জুরের রশি নিয়ে." (সূরা লাহাব ১-৫)

রাসূলুল্লাহ ﷺ দাওয়াতী কাজ পুরো দমে অব্যাহত রাখলেন. জন সমাবেশ স্থলে তিনি প্রকাশ্যভাবে ইসলামের প্রতি আহ্বান জানাতেন. তিনি কা'বা শরীফের নিকটে নামায আদায় করতেন. মানুষের সমাবেশে তিনি উপস্থিত হতেন. তিনি বাজারে মুশরিকদেরকে ইসলামের প্রতি আহ্বান জানাতেন. এ কারণে তিনি বহু কষ্টের শিকার হতেন. মুসলিম- দের উপরে কাফেরদের অত্যাচার ও নিপীড়নের মাত্রা বেড়ে গেলো. ইয়াসের, সুমাইয়্যা ও তাদের সন্তান আম্মারের বেলায় তাই ঘটেছে. আল্লাহদ্রোহীদের নির্যাতনে আম্মারের পিতা-মাতা শহীদ হোন. সুমাইয়্যা ইসলামে প্রথম শহীদের মর্যাদায় ভূষিত হোন.বিলাল ইবনে রাবাহ উমাইয়া ইবনে খালাফ ও আবূ জেহেলের অকথ্য নির্যাতনের শিকার হোন. অবশ্যই বিলাল হযরত আবূ বাকারের ﷺ মাধ্যমে ইসলাম গ্রহণ

করেন. এ খবর শুনে তাঁর মুনিব উমাইয়া ইবনে খালাফ অত্যাচারের সব রকম পন্থা অবলম্বন করে, যাতে বিলাল ইসলাম ত্যাগ করে. কিন্তু তিনি আকঁড়ে ধরেন ইসলামকে এবং অস্বীকার করেন ইসলাম ত্যাগ করতে. উমাইয়া তাঁকে শিকলে বেঁধে মক্কার বাইরে নিয়ে গিয়ে বুকের উপর বিরাট পাথর রেখে উত্তপ্ত বালিতে হেঁচড়াইয়া টানতো. অতঃপর সে ও তার সঙ্গীরা বেত্রাঘাত করতো আর বিলাল শুধু আহাদ, আহাদ, অদ্বিতীয়, অদ্বিতীয়, বলতে থাকতেন. এহেন অবস্থায় এক বার আবূ বাকর তাঁকে দেখেন. তিনি বিলালকে উমাইয়্যার কাছ থেকে ক্রয় ক'রে আল্লাহর নিমিত্তে স্বাধীন করে দেন.

এ সব পৈশাচিক ও বর্বর অত্যাচারের কারণে রাসূলুল্লাহ ﷺ কৌশল অবলম্বন ক'রে মুসলিমদেরকে ইসলাম প্রকাশ করতে নিষেধ করেন. তাদের সাথে মিলিত হতেন অত্যন্ত সংগোপনে. কেননা প্রকাশ্যভাবে মিলিত হলে মুশরিকরা রাসূলের শিক্ষা প্রদানের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করবে. তাছাড়া দু'দলের সংঘর্ষের আশঙ্কাও ছিল. আর এ কথা সুবিদিত যে, এহেন নাজুক পরিস্থিতিতে সংঘর্ষ মুসলিমদের ধ্বংস ও সমূলে বিনাশই ডেকে আনবে. কারণ মুসলিমদের সংখ্যা ও শক্তি-সামর্থ্য ছিল খুবই স্বল্প. তাই তাদের ইসলাম গোপন রাখাটাই ছিল দূরদর্শিতা. অবশ্য রাসূলুল্লাহ ﷺ কাফেরদের অত্যাচার সত্ত্বেও প্রকাশ্যভাবে দাওয়াত ও ইবাদতের কাজ করে যেতেন.

নবীর চাচা হামযা ইবনে আব্দুল মুত্তালিবের ইসলাম গ্রহণ

একদা মুশরিকদের নেতা এবং ইসলামের শত্রু আবূ জেহেল নবী করীম ﷺ-এর পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছিলো তিনি তখন কা'বা শরীফে ছিলেন. সে তাঁকে অনেক গালাগালি করলো এবং কষ্ট দিলো. রাসূলুল্লাহ ﷺ তার কথার কোন উত্তর দিলেন না এবং তাঁর সাথে কথাও বললেন না. ব্যাপারটা কোন এক মহিলা লক্ষ্য করলো. সামান্য পরেই হামযা ইবনে আব্দুল মুত্তালিব ﷺ মক্কার বাইরে থেকে শিকার সফর হতে ফিলে এলেন. উক্ত মহিলা তাঁকে জানিয়ে দিলো আবূ জেহেলের নবী করীম ﷺকে গালমন্দ করার কথা. এ কথা শুনে হামযা ﷺ ক্রোধে ফেটে পড়লেন এবং আবূ জেহেলকে খুঁজতে বের হলেন. তাকে তিনি তার গোত্রের লোকদের সাথে বসা অবস্থায় পেয়ে ধনুক দিয়ে তার মাথায় সজোরে আঘাত করলেন এবং বললেন, 'তুমি মুহাম্মাদকে গালমন্দ করো, অথচ আমি তাঁর দ্বীনেই রয়েছি?' অতএব, এটাই ছিলো তাঁর (হামযা ﷺ) ইসলাম গ্রহণের কারণ. আর তাঁর ইসলাম গ্রহণ ছিলো মুসলিমদের জন্য বড়ই শক্তি ও সামর্থ্যের উৎস. কেননা, মক্কাবাসীদের মাঝে তাঁর ছিলো অতীব মর্যাদা ও প্রভাব.

উমার ইবনে খাত্তাবের ইসলাম গ্রহণ

উমার ইবনে খাত্তাব ﷺর ইসলাম গ্রহণে মুসলিমদের শক্তি-সামর্থ্য আরো দ্বিগুণ হয়ে গেলো. তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন হামযা ﷺর ইসলাম গ্রহণের তিন দিন পর. তিনি একদিন নবী করীম

ﷺকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে বের হোন. পথিমধ্যে এক ব্যক্তির সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়. সে তাঁকে জিজ্ঞেস করলো, হে উমার! কোথায় যাচ্ছ? তিনি বললেন, মুহাম্মাদকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে যাচ্ছি. লোকটি বললো, মুহাম্মাদকে হত্যা করে হাশিম এবং যোহ্‌রা গোত্রের হাত থেকে কিভাবে রক্ষা পাবে? উমার ﷺ বললেন, মনে হচ্ছে তুমিও সে ধর্ম ত্যাগ করেছো, যে ধর্মে তুমি ছিলে. লোকটি বললো, হে উমার! একটি আজব কথা তোমাকে শুনাব না কি? তোমার বোন ও তার স্বামীও ইসলাম গ্রহণ করেছে এবং সেই ধর্মকে ত্যাগ করেছে, যার উপর তুমি আছ. এ কথা শুনে তিনি ক্রোধে জ্বলে উঠলেন এবং সোজা ভগ্নীপতির গৃহাভিমুখে যাত্রা করলেন. সেখানে তখন খাব্বাব ইবনে আরাত ছিলেন. তাঁর সাথে ছিলো একটি সহীফা, যাতে ছিলো সূরা ত্বাহার অংশ যা তিনি (খাব্বাব ﷺ) তাদেরকে তালীম দিচ্ছিলেন. খাব্বাব ﷺ যখন সেখানে উমার ﷺর আগমন টের পেলেন, তখন তিনি বাড়ীর মধ্যে আত্ম- গোপন করলেন. আর ফাতিমা (উমারের বোন) সহীফা খানা লুকিয়ে দিলেন. কিন্তু উমার ﷺ বাড়ীর কাছাকাছি আসার সময় খাব্বাব ﷺর সহীফা পাঠ শুনতে পেয়েছিলেন. তাই তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদেরকে কি যেন পড়তে শুনলাম? তারা বললো, তেমন কিছুই না. আমরা আপসে কথাবর্তা বলছিলাম. উমার ﷺ বললেন, সম্ভবতঃ তোমরা উভয়েই ধর্ম ত্যাগ ক'রে বেদ্বীন হয়ে গেছো. তাঁর ভগ্নীপতি বললেন, আচ্ছা উমার বলতো, সত্য যদি তোমার ধর্ম ছাড়া কোন অন্য ধর্মে থাকে (তখন করণীয় কি হবে)? এ কথা শুনে তিনি জ্বলে

উঠলেন এবং তাঁর ভগ্নীপতিকে নির্মমভাবে প্রহার করতে লাগলেন. তাঁর বোন এসে তাঁকে তাঁর স্বামী থেকে পৃথক করে দিলেন. তাঁকেও তিনি স্বীয় হাত দ্বারা আঘাত করলে তাঁর মুখমTMল রক্তাক্ত হয়ে গেলো. তখন তাঁর বোন ক্রোধ ও আবেগ জড়িত কণ্ঠে পাঠ করলেন, (أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُوْلُ اللهِ) তিনি তাঁর বোনের রক্তাক্ত মুখমন্ডল দেখে বড়ই লজ্জা পেলেন এবং বললেন, তোমাদের কাছে যে বইখানা রয়েছে সেটা দাও তো দেখি আমি পড়বো. তাঁর বোন বললো, তুমি অপবিত্র. আর পবিত্রজন ছাড়া এ বই কারো স্পর্শ করা চলে না. অতএব, তুমি আগে গোসল করো. তিনি উঠে গোসল করলেন এবং বই নিয়ে পড়তে লাগলেন. প্রথমেই তিনি 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' পাঠ ক'রে বললেন, নামগুলো অতীব সুন্দর ও পবিত্র. অতঃপর তিনি সূরা ত্বোহা পড়তে শুরু করলেন এবং ﴿إِنَّنِي أَنَا اللهُ لا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي﴾ পর্যন্ত পাঠ ক'রে বললেন, এ তো বড়ই উত্তম এবং সম্মানিত কথা. আমাকে মুহাম্মাদ ﷺ-এর কাছে নিয়ে চলো. উমার ﷺর এ কথা শুনে খাব্বাব ﷺ ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বললেন, সুসংবাদ শুনে নাও হে উমার! আমি আশা করি এটা হলো তোমার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ যে দুআ করেছিলেন তারই ফল. কারণ, তিনি ﷺ (দুআই) বলেছিলে, ((اللَّهُمَّ أعز الإسلام بعمر بن الخطاب أو بأبي جهل بن هشام)) (হে আল্লাহ! উমার ইবনে খাত্তাব অথবা আবূ জেহেল ইবনে হিশামের দ্বারা ইসলামকে শক্তিশালী করে দাও!)

অতঃপর উমার ﷺ তাঁর তরবারী (হাতে) নিয়ে সেদিকে যাত্রা করলেন যেখানে রাসূলুল্লাহ ﷺ আছে. সেখানে পৌঁছে তিনি দরজায় করাঘাত করলেন. দরজার ফাঁক দিয়ে এক ব্যক্তি কোষবদ্ধ তলোয়ার সহ উমার ﷺকে দেখতে পেলেন. সে অন্যদেরকে তাঁর আগমন বার্তা জানিয়ে দিলে লোকদের মাঝে অস্থিরতা দেখা দিলো. নবী করীম ﷺ বাড়ীর ভিতরে ছিলেন. হামযা ﷺ লোকদের লক্ষ্য ক'রে বললেন, কি ব্যাপার, কি হয়েছে? তারা উত্তরে বললো, উমার এসেছেন. তিনি (হামযা ﷺ) ঠিক আছে তার জন্য দরজা খুলে দাও. সে যদি সদিচ্ছা এবং কল্যাণ লাভের জন্য এসে থাকে, আমরাও তার জন্য তা ব্যয় করবো. আর যদি সে কোন খারাপ উদ্দেশ্য নিয়ে এসে থাকে, তাহলে তারই তরবারী দিয়ে তাকে আমরা হত্যা করবো. এরপর উমার ﷺ ভিতরে প্রবেশ ক'রে ইসলাম গ্রহণ করার ঘোষণা দিলেন. এতে বাড়ীতে উপস্থিত সকলে এমনভাবে 'আল্লাহু আকবার' বলে উঠলেন যে, মসজিদে বিদ্যমান সকলে তা শুনতে পেলো.

সোহাইব রূমী ﷺ বলেন, যখন উমার ﷺ ইসলাম গ্রহণ করলেন, তখন ইসলামের বিকাশ ঘটলো. প্রকাশ্যে ইসলামের প্রতি আহ্বান করা সম্ভব হলো. আমরা গোলাকার হয়ে আল্লাহর ঘরের পাশে বসতে এবং তার তাওয়াফ করতে পারলাম.

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ ﷺ থেকে বর্ণিত. তিনি বলেন, যেদিন উমার ﷺ ইসলাম গ্রহণ করেন, সেদিন হতে আমরা শক্তিশালী হয়েছিলাম.

মুশরিকদের নবী করীম ﷺকে প্রলোভনে ফেলার প্রচেষ্টা

মুশরিকরা যখন দেখলো যে, মানুষ অধিকহারে ইসলামে প্রবেশ করছে এবং তাদেরকে ইসলাম থেকে বাধা দেওয়ার তাদের যাবতীয় প্রচেষ্টা কোনই কাজে আসছে না, তখন তারা অন্য এক উপায় বের করলো যার মাধ্যমে তারা নবী করীম ﷺকে ইসলামের প্রচার এবং তার প্রতি আহ্বান করা হতে বিরত রাখবে. তাই মক্কার সর্দারগণের অন্যতম সর্দার উতবা ইবনে রাবীয়া নবী করীম ﷺ কাছে গেলো যখন তিনি ﷺ মসজিদে একাই বসেছিলেন. সে বললো, হে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র! তুমি তোমার গোত্রের লোকদের নিকট এমন ধরনের এক বড় ব্যাপার নিয়ে এসেছো যে, তার দ্বারা তুমি তাদেরকে বিভক্ত করে দিয়েছো. তাদের উপাস্য ও ধর্মের দোষ-ত্রুটি প্রকাশ ক'রে তাদের পূর্ব পুরুষদেরকে কাফের সাব্যস্ত করেছো. আমি কয়েকটি কথা তোমার কাছে পেশ করছি তা তুমি ভালোভাবে শুনো. হতে পারে কোন কথা তোমার ভালো লাগবে এবং তা তুমি গ্রহণ করবে. রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "আবূল ওয়ালীদ বলো আমি শুনছি." আবূল ওয়ালীদ বললো, হে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র! এই যে বিষয় তুমি নিয়ে এসেছো, এ থেকে তোমার উদ্দেশ্য যদি হয় ধন-সম্পদ অর্জন করা, তাহলে আমরা তোমার জন্য এত বেশী ধন-সম্পদ একত্রিত করে দিবো যে, তুমি আমাদের মধ্যে সব চেয়ে বড় ধনী হবে. আর যদি এর দ্বারা তোমার উদ্দেশ্য হয় মর্যাদা-সম্মান অর্জন করা, তবে আমরা তোমাকে আমাদের নেতা বানিয়ে দিবো এবং তোমাকে ছাড়া অন্য কারো কাছে কোন সমস্যার সমাধান গ্রহণ করবো না. আর যদি

এর দ্বারা তুমি রাজা-বাদশাহ হতে চাও, তাহলে তোমাকে আমরা আমাদের সম্রাট মেনে নিবো. অথবা তোমার কাছে যে আসে সে যদি কোন জ্বিন বা ভূত-প্রেত হয় যাকে তুমি দেখো কিন্তু তাকে তোমার থেকে দূর করতে পারো না, তবে চিকিৎসকদের নিয়ে এসে তোমার চিকিৎসার ব্যবস্থা করাবো এবং তোমার সুস্থতার জন্য যত অর্থের প্রয়োজন হবে তা আমরা ব্যয় করবো. উতবা একনাগারে তার কথা বলতে থাকলো এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ তা শুনতে থাকলেন. যখন সে তার কথা শেষ করলো, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "আবূল ওয়ালীদ! তোমার বলা কি শেষ হয়েছে?" সে বললো, হ্যাঁ. রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "এখন আমার কথা শোন." সে বললো, ঠিক আছে শুনবো. এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ পড়তে শুরু করলেন,

﴿بِسْمِ اللهَّ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، حم، تَنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآناً عَرَبِيّاً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، بَشِيراً وَنَذِيراً فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لا يَسْمَعُونَ﴾ (فصلت:١-٤)

(সেই আল্লাহর নামে শুরু করছি যিনি পরম করুণাময় অসীম দয়ালু. হা-মীম. এটা অবতীর্ণ পরম করুণাময়, অসীম দয়ালুর পক্ষ হতে. একটা (এমন) একটি কিতাব যার আয়াতগুলো বিশদভাবে বিবৃত, এ কুরআন আরবী ভাষায় জ্ঞানী লোকদের জন্য. সুসংবাদদাতা এবং সতর্ককারী, অথচ তাদের অধিকাংশরাই মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে তারা শুনে না.) রাসূলুল্লাহ ﷺ পাঠ করতে থাকেন আর উতবা তার হাত দু'টি পিছনে মাটির উপর রেখে তাতে ভর দিয়ে নীরবে তা

শুনতে থাকে. এইভাবে পাঠ করতে করতে তিনি সাজদার আয়াতে পৌঁছে সাজদা করলেন. অতঃপর বললেন, "আবূল ওয়ালীদ! তোমার যা শোনার ছিলো তা শুনেছো এখন তুমি জানো ও তোমার কর্ম." অতঃপর উতবা সেখান থেকে উঠে তার সাথীদের কাছে চলে গেলো. তাকে আসতে দেখে মুশরিকরা আপসে বলাবলি করতে লাগলো, আল্লাহর শপথ! আবূল ওয়ালীদ সেই মুখ নিয়ে আসছে না যে মুখ নিয়ে সে গিয়ে ছিলো. যখন সে তাদের কাছে গিয়ে বসলো, তখন তারা জিজ্ঞেস করলো, আবূল ওয়ালীদ! তোমার পিছনের খবর কি? সে বললো, পিছনের খবর হলো এই যে, আমি এমন কথা শুনলাম, আল্লাহর শপথ এ রকম কথা কোন দিন শুনিনি. আল্লহর শপথ! তা যাদুও নয়, কবিতাও নয় এবং কোন গণকের কথাও নয়. হে কুরাইশগণ! আমার কথা মেনে নিয়ে তাঁকে (নবীকে) তাঁর অবস্থাতেই ছেড়ে দাও. আল্লাহর শপথ! আমি যে বাণী শুনলাম তার দ্বারা অতিশয় কোন গুরুতর ব্যাপার সংঘটিত হবে. যদি তাঁকে কোন আরব হত্যা করে ফেলে, তবে তো তোমাদের কাজটা অন্যের দ্বারাই সম্পন্ন হয়ে যাবে. আর তিনি যদি আরবদের উপর বিজয়ী হোন, তবে তাঁর রাজত্ব প্রকৃতপক্ষে তোমাদেরই রাজত্ব হবে. তাঁর শক্তি তোমাদেরই শক্তি হবে এবং তাঁর মাধ্যমে তোমরাই সর্বাধিক সৌভাগ্যবান হবে. (ওয়ালীদের মুখ থেকে এ কথা শুনে) তারা বললো, আল্লাহর শপথ! হে আবূল ওয়ালীদ! তিনি তাঁর জবান দ্বারা তোমাকে যাদু করেছে. সে বললো, তাঁর ব্যাপারে আমার এটাই অভিমত, এখন তোমাদের যা করার করো.

হাবশার দিকে হিজরাত

যাঁর ইসলামের কথা ফাঁস হয়ে যেত, তিনি মুশরিকদের নিপীড়নের সহজ লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হতেন. বিশেষতঃ দুর্বল মুসলিমরা. তাই সাহাবাগণ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট নিজেদের দ্বীন সহ হাবশায় (ইথিওপিয়া) হিজরত করার অনুমতি চাইলেন. সেখানে তাঁদের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা ছিলো. বিশেষতঃ অনেক মুসলিম নিজের জান ও পরিবার বর্গের উপর কুরাইশদের যুলুমের ভয় করছিলেন. কাজেই রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁদেরকে অনুমতি দিলেন. নবূওয়াতের ৫ম বছরে প্রায় ৭০জন মুসলিম সপরিবারে হিজরত করেন. তাঁদের মধ্যে উসমান ইবনে আফফান ও তাঁর স্ত্রী রুকাইয়্যাও ছিলেন. এ দিকে কুরাইশরা ইথিওপিয়ায় হিজরতকারীদের অবস্থান ব্যাহত করার চেষ্টা করে. সে দেশের রাজার জন্য পাঠায় উৎকোচ. পলায়নকারী (মুহাজির)দের তাদের নিকট ফিরিয়ে দেওয়ার আবেদন জানায়. তারা তাঁকে (রাজাকে) এ কথাও বলে যে, মুসলিমরা ঈসা ﷺ ও মরিয়ম সম্পর্কে অপমানকর ও অশিষ্ট বাক্য ব্যবহার করে. নাজ্জাশী তাদেরকে ঈসা ﷺসম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তাঁরা সুস্পষ্টভাবে কুরআন ঈসা ﷺসম্পর্কে যা বলেছে, তা পরিষ্কার ক'রে বলে দেন এবং সত্যটি স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেন. তাঁর সামনে সূরা মারিয়ামের তেলাওয়াত করেন. ফলে তিনি তাঁদেরকে নিরাপত্তা দান করেন এবং তাঁদেরকে কুরাইশদের হাতে সমর্পন করতে অস্বীকার করেন.

এ বছরের রমযান মাসে রাসূলুল্লাহ ﷺ হারাম শরীফে মানুষের কাছে যান. তিনি দাঁড়িয়ে তাদের সামনে সুরায়ে নাজ্‌ম তেলাওয়াত করতে লাগেন. সেখানে কুরাইশদের এক বিরাট দল ছিলো. এ সব কাফেররা ইতিপূর্বে কখনো আল্লাহর বাণী শুনেনি. কেননা তারা রাসূলের কিছুই না শুনার পদ্ধতি অনুসরণ করে আসছিলো. অকস্মাৎ তেলাওয়াতের মধুর ধ্বনি তাদের কর্ণে গেলে তারা আল্লাহর হৃদয়গ্রাহী চিত্তাকর্ষক বাণী ও সাবলীল ভাষা একাগ্রচিত্তে শুনে. সে সময় তাদের অন্তরে তা ছাড়া অন্য কিছুই ছিলো না. এক পর্যায়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ ﴿فَاسْجُدُوا لله واعْبُدُوا﴾ আয়াতটি পড়ে সাজদায় চলে যান. উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে কেউ নিজেদেরকে নিয়ন্ত্রণ করতে না পেরে তারাও সাজদায় চলে যায়.

কুরাইশরা দাওয়াত দমন করার জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করে. শাস্তি, নির্যাতন, নিপীড়ন, প্রলোভন ও হুমকি প্রদর্শনের মতো সর্ব প্রকার পন্থা গ্রহণ করে. কিন্তু এসব কু-পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা মুসলিমদের ঈমান বৃদ্ধি ও দ্বীন ইসলামকে অধিকতর আঁকড়ে ধরা ছাড়া আর কোন ভূমিকা রাখতে পারেনি. এখন এক নতুন দুরভিসন্ধি ও মন্দ অভিপ্রায় তাদের অন্তরে জন্ম নিলো. আর তা হচ্ছে মুসলিম ও বনী হাশেমকে সম্পূর্ণভাবে বর্জন ও একঘরে করে রাখার এক চুক্তিনামা লিখে সবাই তাতে স্বাক্ষর করে কাবাশরীফের অভ্যন্তরে ঝুলিয়ে দেবে. চুক্তি অনুসারে তাদের সাথে বেচা-কেনা, বিয়ে-শাদি, সাহায্য-সহযোগিতা ও লেন-দেন সম্পূর্ণভাবে বন্ধ থাকবে. এ চুক্তির ফলে মুসলিমরা বাধ্য হয়ে মক্কা থেকে বের হয়ে

(শে'বে আবি তালেব নামক) এক উপত্যকায় গিয়ে আশ্রয় নেন. তাঁরা সেখানে অবর্ণনীয় ক্লেশ ও দুঃখের শিকার হোন. ক্ষুধা ও অর্ধাহারের বিষাক্ত ছোবল থেকে কেউ রক্ষা পায়নি. সচ্ছল ও সামর্থ্যবান ব্যক্তিরা নিজেদের সমস্ত ধন-সম্পদ ব্যয় করে ফেলেন. খাদীজা তাঁর সম্পূর্ণ অর্থ ব্যয় করেন. বিভিন্ন রোগ ছড়িয়ে পড়লো. অধিকাংশ লোকই মৃত্যুর প্রায়-দ্বার প্রান্তে এসে দাঁড়ালেন. কিন্তু তাঁরা ধৈর্য অবিচলতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন. তাঁদের মধ্যে একজনও পশ্চাদপদ হননি. অবরোধ একাধারে তিন বছর স্থায়ী রইল. অতঃপর বানী হাশেমের সাথে আত্মীয়তা আছে এমন কিছু শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি জনসমাবেশে চুক্তি ভঙ্গ করার কথা ঘোষণা করে. চুক্তির কাগজ বের করা হলে দেখা গেলো যে উইপোকা সেটা খেয়ে ফেলেছে. শুধুমাত্র কাগজের এক কোণ যেখানে "বিসমিকা আল্লাহুম্মা" বাক্যটি ব্যতীত কোন স্থানই অক্ষত ছিলো না. সংকটের অবসান হল. আর মুসলিম ও বানী হাশেম মক্কায় ফিরে আসলেন. কিন্তু কুরাইশরা মুসলিমদের দমন ও মুকাবিলায় সেই রকমেরই জঘন্য আচরণ অব্যাহত রেখে ছিলো. তারা লোকদেরকে নবী করীম ﷺ-এর সাথে মিলতে এবং কুরআন শুনতে দিতো না. যে আরবই তাদের কাছে আসতো তাকে তারা (নবীর ব্যাপারে) সাবধান করে দিতো. যেমন, তুফাইল ইবনে আম্‌র আদ্দাউসী ﷺ থেকে বর্ণিত. তিনি নিজের ব্যাপারে বললেন যে, তিনি মক্কায় এলে কুরাইশদের কিছু লোক তাঁর কাছে আসে. তুফাইল ﷺ তাঁর গোত্রের গণ্য-মান্য ব্যক্তি ছিলেন. তারা তাঁকে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে সাবধান করে এবং তাঁর কাছে যেতে ও তাঁর কাছে থেকে কিছু শুনার

ব্যাপারে ভয় দেখায়. তারা বললো যে, তাঁর কথার মধ্যে এমন যাদু আছে যে, তার দ্বারা পিতা ও পুত্রের মধ্যে, ভাই ও ভাইয়ের মধ্যে এবং স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে যায়. তুফাইল ﷺ বলেন, আল্লাহর শপথ! তারা আমাকে বরাবর বুঝাতে থাকলো. অবশেষে আমি সিদ্ধান্ত নিলাম যে, তাঁর কাছ থেকে কিছুই শুনবো না এবং তাঁর সাথে কথাও বলবো না. এমনকি আমি আমার কানের ভিতরে তুলো প্রবশ করিয়ে নিলাম যাতে তাঁর কোন কথা আমার কর্ণগোচর না হয়.

অতঃপর আমি মসজিদে হারামে গেলাম. তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ কা'বার পাশে দাঁড়িয়ে নামায পড়ছিলেন. আমি তাঁর কাছাকাছি দাঁড়ালাম. হয়তো আল্লাহর ইচ্ছা এটাই ছিলো আমাকে তাঁর কোন কথা শুনাবেন. আমি অতি সুন্দর কথা শুনলাম. আমি মনে মনে বললাম, আমি তো একজন বুদ্ধিমান মানুষ ও কবি. আমার কাছে ভালোমন্দ গোপন থাকে না. অতএব তাঁর কাছ থেকে শুনতে আমার বাধা কিসের? যদি তাঁর কথা-বার্তা ভালো হয়, গ্রহণ করে নিবো. আর যদি মন্দ হয়, তবে তা বর্জন করবো. আমি কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলাম. অবশেষে যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর বাড়ীর পথ ধরলেন, আমিও তাঁর পিছনে পিছনে যাত্রা করলাম. যখন তিনি বাড়ীতে প্রবেশ করলেন, আমিও প্রবেশ করলাম. তারপর বললাম, হে মুহাম্মাদ! তোমার জাতির লোকেরা আমাকে এই এই কথা বললো. আল্লাহর শপথ! তারা আমাকে বরাবর ভয় দেখিয়ে গেলো. পরিশেষে আমি আপনার কোন কথা না শুনার জন্য কানে তুলো প্রবেশ করিয়ে নিলাম. কিন্তু আল্লাহ আপনার কথা আমাকে শুনাতে

চাইলেন. তাই অতি উত্তম কথা আমি শুনলাম. এখন আপনার বক্তব্য পেশ করুন! তিনি আমার নিকট ইসলামের কথা পেশ করলেন এবং আমাকে কুরআন পড়ে শুনালেন. আল্লাহর শপথ! এর চাইতে উত্তম কথা এবং ইনসাফের বানী আমি ইতিপূর্বে কখনোও শুনেনি. অতঃপর আমি ইসলাম গ্রহণ ক'রে সত্যের সাক্ষ্য দিলাম. অতঃপর তুফাইল ﷺ তাঁর গোত্রের লোকদের কাছে ফিরে গিয়ে তাদেরকেও ইসলামের প্রতি আহ্বান জানালো এবং ইসলাম কি তা তাদের কাছে বর্ণনা করলো. ফলে তাঁর পরিবারের লোক ইসলাম গ্রহণ করলো এবং তাঁর গোত্রে ইসলাম সম্প্রসারিত হলো.

দুঃখের বছর

কঠিন রোগ ব্যাধি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চাচা আবূ তালেবের দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে ছড়িয়ে যায়. সে মৃত্যু শয্যায় শায়িত হয়ে পড়ে. মুমূর্ষাবস্থায় যখন সে মৃত্যু যন্ত্রণায় কাতর তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তার মাথার পার্শ্বে বসে মৃত্যুর পূর্বে তাকে কালেমায়ে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পড়ার অনুরোধ জানান. কিন্তু আবূ জেহেল সহ অসৎ সঙ্গীরা যারা তার পার্শ্বে ছিল, তাকে বাধা দিয়ে বললো, শেষমূহূর্তে পূর্ব পুরুষের ধর্ম ত্যাগ করবে? আব্দুল মুত্তালিবের ধর্ম থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবে? শেষ পর্যন্ত সে মুশরিক হয়েই মারা গেলো. চাচার কাফের হয়ে মৃত্যু বরণ করার ফলেই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দুঃখ দ্বিগুণ বেড়ে যায়. আবূ তালেবের মৃত্যুর প্রায় দু'মাস পরে হযরত খাদীজা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) ওফাত বরণ করেন. ফলে রাসূলুল্লাহ ﷺ

অত্যন্ত চিন্তিত হোন.তাঁর চাচা আবূ তালিব এবং স্ত্রী খাদীজা (রাযিয়াল্লাহু আনহার)র মৃত্যুর পরে কুরাইশের ঔদ্ধাত্য ও উপদ্রব আরো বেড়ে যায়.

যাঁরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দাওয়াতে সাড়া দিয়েছিলেন তাঁদের অধিকাংশই ছিলেন দুর্বল শ্রেণীর লোক ও ক্রীতদাস. আর সাধারণতঃ এই ধরনের লোকেরাই নবীদের ডাকে সাড়া দেয়. কারণ, অন্যের আনুগত্য শিকার করতে তাদের জন্য কঠিন হয় না. পক্ষান্তরে বড়রা এবং মর্যাদা ও আধিপত্যের অধিকারী ব্যক্তিবর্গদের কাছে তা কঠিন হয়. তাদের অহংকার, হিংসা-বিদ্বেষ এবং মর্যাদা ও পদের লোভ সাধারণতঃ তাদেরকে অপরের আনুগত্য শিকার করতে বাধা দেয়.

দাওয়াতের পথে বাধা দেওয়ার মুশরিকদের বিভিন্ন ধারা

দাওয়াতের পথে বাধা দেওয়ার জন্য এবং ইসলামের প্রচার-প্রসারের কাজ বন্ধ করার জন্য মুশরিকরা নানামুখী পন্থা অলবম্বন করে. লোক- দেরকে ইসলাম থেকে বিরত রাখার জন্য তারা বহু উপায়-উপকরণ গ্রহণ করে. তার মধ্যে হলো,

১. ধমক ও হুমকি

কুরাইশ সর্দারদের একটি দল নবীর চাচা আবূ তালিবের কাছে গিয়ে বলে, মুহাম্মাদ আমাদের কষ্ট দেয় এবং আমাদের উপাস্যদের সম্পর্কে মন্দ মন্তব্য করে, অতএব আপনি তাকে এ থেকে বাধা দিন. তিনি (আবূ তালিব) তাঁকে ডেকে পাঠান এবং বলেন, হে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র! তোমার চাচার গোত্রের লোকেরা মনে করে যে,

তুমি তাদেরকে কষ্ট দাও এবং তাদের উপাস্যদের সম্পর্কে মন্দ মন্তব্য করো. অতএব এ থেকে তুমি বিরত থাকো. রাসূলুল্লাহ ﷺ সূর্যের দিকে ইঙ্গিত ক'রে বললেন, "তোমাদের জন্য এটা আমি ত্যাগ করতে পারি না, যদিও ঐ সূর্য থেকে একটি অগ্নিশিখা আমার জন্য এনে দাও." এ কথা শুনে আবূ তালিব বললেন, আমার ভ্রাতুষ্পুত্র মিথ্যা বলেনি. অতএব তাঁকে তাঁর অবস্থায় ছেড়ে দাও.

২. বাতিল আপবাদ

তারা নবী করীম ﷺ-এর উপর পাগল, যাদুকর এবং মিথ্যুক হওয়ার অপবাদ দিয়েছিলো. আর এ অপবাদও দিয়েছিলো যে, তিনি যা নিয়ে এসেছেন, তা হলো পূর্ববর্তীদের কিচ্ছা-কাহিনী.

৩. ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও হাসাহাসি

বেশীরভাগ তারা নবী করীম ﷺ এবং তাঁর সাথীদের নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতো. যখনই তাঁরা তাদের পাশ দিয়ে যেতেন, তখন তারা তাঁদেরকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ এবং নবী করী ﷺ-এর ব্যাপারে কটুক্তি করতো.

৪. তাঁর শিক্ষার বিকৃতি, সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি এবং মিথ্যা প্রচার

তারা এই প্রচার করতো যে, কুরআন হলো পূর্ববর্তীদের কিচ্ছা-কাহিনী. অনুরূপ তারা এ কথা বলতো যে, তাঁকে (নবীকে) যে শিক্ষা দেয়, সে হলো একজন মানুষ.

৫. রাসূলুল্লাহ ﷺকে কষ্ট দেওয়া

বিগত উপায়-উপরকণ যখন নবী করীম ﷺকে ও তাঁর সাথীদেরকে দ্বীন থেকে বিরত রাখার ব্যাপারে ফলপ্রসূ হলো না,

তখন কুরাইশরা শারীরিক কষ্ট দেওয়ার পন্থা অবলম্বন করলো. যেমন, উক্ববা ইবনে আবূ মুয়ীত নবী করীম ﷺ-এর কাছে এলো যখন তিনি ﷺ নামায পড়ছিলেন এবং স্বীয় চাদর তাঁর (নবী করীম ﷺ-এর) গর্দানে জড়িয়ে সজোরে টান দিলো. পিছন থেকে আবূ বাকার ﷺ এসে তাকে তাঁর থেকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে বললেন, তোমরা এমন এক ব্যক্তিকে হত্যা করতে চাও, যিনি বলেন, আমার প্রতিপালক আল্লাহ এবং তিনি তাঁর প্রতিপালকের কাছ থেকে তোমাদের কাছে প্রমাণাদিও নিয়ে এসেছেন. অনুরূপ একদা যখন তিনি ﷺ হারাম শরীফে নামাম পড়ছিলেন এবং আবূ জেহেল ও তার সাথী-সঙ্গীরা বসেছিলো. আবূ জেহেল বললো, কে আছে তোমাদের মধ্যে এমন যে অমুক গোত্রের উঁটের ভুঁড়ি আনতে পারবে এবং মুহাম্মাদ যখন সেজদায় যাবে, তখন তাঁর ঘাড়ে চাপিয়ে দিবে. তাদের একজন গিয়ে তা এনে নবী করীম ﷺ-এর সাজদারত অবস্থায় থাকাকালীন তাঁর উভয় কাঁধের মধ্যেখানে চাপিয়ে দিলো. অতঃপর তারা আপসে হাসতে হাসতে একে অপরের উপর লুটিয়ে পড়লো. নবী করীম ﷺ-এর মেয়ে ফাতিমা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এসে তা তাঁর পীঠ থেকে সরিয়ে দিলেন.

একদা আবূ জেহেল বললো, যদি মুহাম্মাদকে আবার নামায পড়তে দেখি, তাহলে তাঁর ঘাড়কে পদতলে পিষ্ঠ করে দিবো এবং তাঁর মুখে মাটি লেপে দিবো. অতঃপর একদিন যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ নামায পড়ছিলেন, সে তাঁর ঘাড় পিষ্ঠ করার নিয়তে অগ্রসর হয়, কিন্তু আকস্মিকভাবে সে পশ্চাদপসরণ শুরু করে এবং দুই হাত

দিয়ে বাঁচার প্রচেষ্টা চালায়. উপস্থিত লোকেরা বললো, আবূল হাকাম! তোমার ব্যাপার কি? সে বললো, আমার ও তাঁর মাঝে আগুনের গর্ত রয়েছে.

৬. তাঁর সাথীদের কষ্ট দেওয়া

তারা নবী করীম ﷺ-এর সাথীদের উপরও চালাতো নির্মম অত্যাচার এবং তাঁদেরকে বিভিন্নভাবে নিপীড়িত করতো. কোন কোন ক্রীতদাসকে বেঁধে প্রখর রোদে ফেলে রাখতো এবং তাঁর উপর চালাতো নানা প্রকারের নির্যাতন. আম্মার ও তাঁর পিতা-মাতার উপর চালায় বিভিন্ন প্রকারের উৎপীড়ন. কঠিন আযাবে অসহ্য হয়ে তাঁর পিতা শহীদ হোন. খাব্বাব ইবনে আরাত ﷺকে তাঁর চুল ধরে টেনে নিয়ে বেড়াতো এবং উত্তপ্ত পাথরের উপর তাঁকে রেখে দিয়ে তাঁর উপর চাপিয়ে দিতো ভারী পাথর. অনুরূপ উমার ইবনে খাত্তাব ﷺ যখন ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, তখন তাঁর উপরও নির্যাতন চালিয়ে ছিলো এবং তাঁকে হত্যা করার প্রচেষ্টা নিয়েছিলো

রাসূলুল্লাহ ﷺ তায়েফে

কুরাইশের ধৃষ্টতা এবং মুসলিমদের প্রতি তাদের নির্যাতন ও নিপীড়নের নীতি অব্যাহত থাকার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ তায়েফ গমনের সিদ্ধান্ত নেন. হতে পারে আল্লাহ তাদেরকে হেদায়েত দান করবেন. তায়েফ গমন সহজ ব্যাপার ছিল না. আকাশ চুম্বি উচুঁ উচুঁ পাহাড়ের কারণে পথ ছিল দুর্গম. তায়েফবাসীরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে সর্বাপেক্ষা মন্দ আচরণ করে. তারা তাঁর (রাসূলের) কথা তো শুনলোই না, বরং তাঁকে বিতাড়িত করে এবং শিশু ও

কিশোরদেরকে তাঁর পিছনে লেলিয়ে দেয়. ফলে তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপর প্রস্তর নিক্ষেপ ক'রে তাঁর গোড়ালীকে করে রক্তে রঞ্জিত. তিনি ভীষণ দুঃখিত হয়ে মক্কা অভিমুখে রওয়ানা হোন. পথি মধ্যে জিবরীল عليه السلام পাহাড়ের দায়িত্বে নিযুক্ত ফেরেশতাসহ এসে বলেন, আল্লাহ পাহাড়ের দায়িত্বে নিযুক্ত ফেরেশতাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন. আপনি যা ইচ্ছা নির্দেশ দিতে পারেন. ফেরেশতা আরজ করলেন, হে মুহাম্মাদ! আপনি যদি চান আমি তাদের উপর আখসাবাইন (মক্কাকে ঘিরে রাখা দুই পাহাড়) চেপে দিবো. তিনি বললেন, বরং আমি আশা করি আল্লাহ তাদের বংশ থেকে এমন লোক সৃষ্টি করবেন, যারা শুধুমাত্র আল্লাহরই ইবাদত করবে, তাঁর সাথে কোন শরীক স্থাপন করবে না.

চন্দ্র দু'টুকরো হওয়া

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে মুশরিকদের বহু দ্বন্দ্বের মধ্যে এও ছিলো যে, তারা অনেক সময় রাসূলুল্লাহ ﷺকে অপারগ, অক্ষম সাব্যস্ত করার ফন্দিতে বিভিন্ন অলৌকিক নিদর্শন দেখানোর দাবী করতো. আর এ ধরণের দাবী বারংবার উত্থাপন করেছে তারা. এক বার চন্দ্রকে দু'টুকরো করার দাবী জানায়,রাসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহর কাছে দুআ করলে তাদেরকে চন্দ্র দু'টুকরো করে দেখানো হয়. কুরাইশরা এ নিদর্শন দীর্ঘ সময় পর্যন্ত দেখতে থাকে. কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা ঈমান আনায়ন করেনি. বরং তারা বলে, মুহাম্মাদ আমাদেরকে যাদু করেছে. তন্মধ্যে এক ব্যক্তি বললো, আমাদেরকে যাদু করলেও সব মানুষকে তো আর যাদু করতে পারবে না. বহিরাগত মুসাফিরদের অপেক্ষা

করো. বিভিন্ন মুসাফির আসলে জিজ্ঞেস করা হয় এবং তারা বলে, হ্যাঁ আমরাও দেখেছি. কিন্তু কুরাইশরা নিজেদের কুফ্‌রীতে জেদ ধরে রয়ে গেলো.

ইসরা-মিরাজ

তায়েফ থেকে তায়েফবাসীদের রূঢ় ও অমানবিক আচরণ লাভের পর যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ সেখান থেকে ফিরে এলেন এবং আবূ তালিব ও খাদীজার মৃত্যু সহ কুরাইশের অত্যাচার যখন বহু গুণে বৃদ্ধি পেলো, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অন্তরে একাধিক চিন্তা একত্রিত হলো. তাই মহান রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে শোকাহত ও দুঃখে কাতর নবীর সান্ত্বনা আসলো. কোন এক রাতে যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ নিদ্রারত ছিলেন, জিবরীল বুরাক নিয়ে আসেন. বুরাক ঘোড়া সদৃশ এক জন্তু যার দু'টি দ্রুতমান পাখা আছে এবং তার গতি বিদ্যুতের ন্যায়. রাসূলুল্লাহ ﷺকে তাতে আরোহণ করানো হয় এবং জিবরীল তাকে ফিলিস্তীনে বাইতুল মুকাদ্দাসে প্রথমে নিয়ে যান. অতঃপর সেখান থেকে আসমান পর্যন্ত নিয়ে যান. এ ভ্রমণে তিনি পালনকর্তার বড় বড় অনেক নিদর্শন পরিদর্শন করেন. আসমানেই পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরজ করা হয়. তিনি একই রাত্রে তুষ্ট মন ও সুদৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে মক্কায় প্রত্যাগমন করেন. মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ [الاسراء:١]

অর্থাৎ, "পরম পবিত্র ও মহিমাময় সত্তা তিনি, যিনি স্বীয় বান্দাকে রাত্রি বেলায় ভ্রমণ করিয়েছিলেন মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত-যার চারদিকে আমি পর্যাপ্ত বরকত দান করেছি-যাতে আমি তাঁকে কুদরতের কিছু নিদর্শন দেখিয়ে দেই. নিশ্চয় তিনি পরম শ্রবণকারী ও দর্শনশীল." (সূরা ইসরাঃ ১)

ভোর বেলায় কাবাশরীফে গিয়ে তিনি লোকদেরকে একথা শুনালে কাফেরদের মিথ্যা অভিযোগ ও ঠাট্টা-বিদ্রূপ আরো বেড়ে যায়. উপস্থিত কয়েকজন লোক তাঁকে বাইতুল মুকাদ্দাসের বিবরণ দিতে বলে. মূলতঃ উদ্দেশ্য ছিল তাঁকে অপারগ ও অক্ষম প্রমাণিত করা. তিনি তন্ন তন্ন করে সব কিছু বলতে লাগলেন. কাফেররা এতে ক্ষান্ত না হয়ে বলে, আমরা আর একটি প্রমাণ চাই. রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আমি পথে মক্কাগামী একটি কাফেলার সাক্ষাৎ পাই এবং তিনি কাফেলার বিস্তারিত বিবরণসহ উটের সংখ্যা ও আগমনের সময়ও বলে দিলেন. রাসূলুল্লাহ ﷺ সত্যই বলেছেন কিন্তু কাফেররা হঠকারিতা, কুফ্‌রী ও সত্যকে অস্বীকার করার দরুন উদভ্রান্ত রয়ে গেল. সকাল বেলায় জিবরীল এসে রাসূলুল্লাহ ﷺকে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পদ্ধতি ও সময়সূচী শিখিয়ে দিলেন. ইতিপূর্বে নামায শুধু সকাল বেলায় দু'রাকয়াত ও বিকেল বেলায় দু'রাকয়াত ছিলো.

কুরাইশরা সত্য অস্বীকার করতে থাকায় এ দিনগুলোতে তিনি মক্কায় আগমনকারী ব্যক্তিদের মাঝে দাওয়াতী তৎপরতা চালাতে লাগলেন. তিনি তাদের অবস্থান স্থলে মিলিত হয়ে ইসলাম পেশ করতেন এবং তাদের সামনে তার সুন্দর ব্যাখ্যা দিতেন. আবূ লাহাব তাঁর পিছনে তো লেগেই থাকতো. সে লোকদেরকে তাঁর ও

তাঁর দাওয়াত থেকে সতর্ক থাকতে বলতো. একবার মদীনা থেকে আগত এক দলকে ইসলামের আহবান জানালে তাঁরা মনোযোগ দিয়ে শুনেন এবং তাঁর অনুসরণ ও তাঁর প্রতি ঈমান আনতে ঐক্যবদ্ধ হোন. মদীনাবাসীরা ইয়াহুদীদের কাছে শুনতো যে, অদূর ভবিষ্যতে এক নবী প্রেরিত হবেন. তাঁর আবির্ভাবের যুগ নিকটে এসে গেছে. তাঁদেরকে যখন তিনি ইসলামের দাওয়াত দেন,তাঁরা বুঝতে পারলেন যে, তিনি সেই নবী, যাঁর কথা ইয়াহুদীরা বলেছে. তাঁরা সত্বর ইসলাম গ্রহণ করে ফেলেন এবং বলেন ইয়াহুদীরা যেন আমাদের অগ্রগামী না হয়. তাঁরা ছিলন ৬জন পরবর্তী বছরে মদীনা থেকে ১২জন আসেন. তাঁরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হলে তিনি তাঁদেরকে ইসলাম শিক্ষা দেন. প্রত্যাবর্তনের সময় তাঁদের সাথে তিনি মুসআব ইবনে উমাইর ﷺকে কুরআন ও দ্বীনের বিধানাবলী শিক্ষা দেয়ার জন্য পাঠান. মুসআব ﷺ মদীনায় বিরাট প্রভাব ফেলতে সক্ষম হোন. এক বছর পর তিনি যখন মক্কায় আসেন, তখন তাঁর সাথে ৭২ জন পুরুষ ও দু'জন মহিলা ছিলন. রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁদের সাথে মিলিত হোন এবং তাঁরা দ্বীনের সহযোগিতা ও এর প্রতি যথাযথ দায়িত্ব পালনের দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন. অতঃপর তাঁরা মদীনায় ফিরে যান.

মদীনার দিকে হিজরত

মদীনা সত্য ও সত্যের ধারকদের আশ্রয়ে পরিণত হয়. মুসলিমরা সেদিকে হিজরত করতে লাগলেন. তবে কুরাইশরা ছিল মুসলিমদের হিজরত করতে বাধা দেয়া ও প্রতিরোধ সৃষ্টি করার জন্য

বদ্ধপরিকর. ফলে কতিপয় মুহাজির বিভিন্ন প্রকার শাস্তি ও নির্যাতনের শিকার হোন. কুরাইশদের ভয়ে মুসলিমরা গোপনে হিজরত করতেন. আবূ বকর সিদ্দীক রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট হিজরতের অনুমতি চাইলে তিনি তাঁকে বলেন, **"তাড়াহুড়া করো না. আশা করি আল্লাহ তোমার জন্য একজন সঙ্গী নির্দ্ধারণ করবেন."** অধিকাংশ মুসলিমরা ইতিপূর্বে হিজরত করেছেন. মুসলিমদের হিজরত এবং মদীনায় তাঁদের একত্রিত হওয়া দেখে কুরাইশরা প্রায় উন্মাদ হয়ে পড়লো. মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)-এর দাওয়াতের উন্নতি ও উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ভয় ও আশঙ্কা বোধ করলো. সবাই পরামর্শ করে রাসূলুল্লাহ ﷺকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নিলো. আবূ জেহেল প্রস্তাব পেশ করল যে, প্রত্যেক গোত্রের এক একজন নির্ভীক যুবককে তরবারী দেয়া হবে. এরা মুহাম্মাদকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেলে এক যোগে আক্রমণ করে হত্যা করবে. ফলে তার খুনের অপরাধ বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে ছড়িয়ে যাবে. বনীহাশেম এর পর সব গোত্রের সাথে লড়াই করার হিম্মত করবে না. আল্লাহ তাঁর নবীকে তাদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে অবহিত করে দেন. তিনি আল্লাহর অনুমতিক্রমে আবূ বাকরের সাথে হিজরত করার সিদ্ধান্ত নেন. রাতে আলী ﷺকে নিজের বিছানায় শুয়ে থাকতে বললেন, যাতে লোকেরা মনে করে যে, রাসূল বাড়ীতেই আছেন. ইতিমধ্যে কাফেররা বাড়ী ঘেরাও করে ফেলেছে. বিছানায় আলীকে দেখে তাঁরা নিশ্চিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বাড়ীতে আছেন এবং হত্যা করার জন্য তাঁর বের হওয়ার অপেক্ষা করতে লাগলো. এ দিকে মুহাম্মাদ ﷺবের হয়ে সবার মাথার উপর বালু ছিটিয়ে দিলে

আল্লাহ তাদের দৃষ্টি শক্তি ছিনিয়ে নেন. ফলে তারা আঁচও করতে পারলো না যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বেরিয়ে গেলেন. অতঃপর আবূ বকর ﷺ সহ প্রায় পাঁচ মাইল অতিক্রম ক'রে "সওর নামক" এক গুহায় লুকিয়ে থাকেন.কুরাইশ যুবকেরা ভোর বেলা পর্যন্ত অপেক্ষা করে. আলী ﷺ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিছানা থেকে উঠলে তাদের হাতে পড়েন. তারা তাঁকে রাসূলুল্লাহ ﷺ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করলে তিনি তাদেরকে কোনই খবর দেন নি. ফলে তারা তাঁকে মার-ধর ও তাঁকে নিয়ে টানাটানি করে. কিন্তু কোন ফল হয় নি. অতঃপর কুরাইশরা চতুর্দিকে লোক-জন পাঠিয়ে দেয়. মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)কে জীবিত বা মৃত অবস্থায় ধরে দিতে পারার জন্য ১০০টি উঁট পুরস্কার ঘোষণা করা হয়. লোক-জন তাঁর অনুসন্ধানে সেই গুহার দ্বার প্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছে যায়, যেখানে নবী করীম ﷺ ও তাঁর সাথী লুকিয়ে আছেন. এমন কি যদি তাদের কেউ স্বীয় পায়ের দিকে একটু ঝুঁকে গুহার ভিতর তাকায়, তাহলে, তাঁদের দেখতে পায়. রাসূলের ব্যাপারে আবূ বাকারের ﷺ চিন্তা ও উদ্বেগ বেড়ে যায়. তা দেখে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেন, "তুমি কি মনে করো আমরা দু'জন, বরং আমাদের সাথে তৃতীয়জন আল্লাহ আছেন. চিন্তা করো না, আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন." অনুসন্ধানকারীরা তাদের সন্ধান আর পেল না.

গুহায় তাঁরা তিন দিন অবস্থান ক'রে মদীনার পথে যাত্রা শুরু করেন. পথ ছিল সুদীর্ঘ ও দুর্গম. সূর্য ছিল অতীব উত্তপ্ত. দ্বিতীয় দিন বিকেল বেলায় এক তাঁবুর পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছিলেন, যেখানে উম্মে

মা'বাদ নামে এক মহিলার তাঁবু ছিলো. তাঁরা তার কাছে খাবার ও পানি চাইলেন কিন্তু কিছুই পেলেন না. তবে একটি ছাগী এতই দুর্বল ছিল যে, ঘাস খেতে যেতে পারেনি. এক ফোঁটা দুধ তার স্তনে ছিল না. রাসূলুল্লাহ ﷺ স্তনের উপর তাঁর মুবারক হাত বুলিয়ে দিয়ে দুধ দোহন ক'রে এক বড় পাত্র ভরে নেন. উম্মে মা'বাদ এ অলৌকিক ঘটনা দেখে বিস্মিত ও বিহবল হয়ে পড়ে. সবাই পেটপুরে পান করেন. অতঃপর আর এক পাত্র ভরে উম্মে মা'বাদকে দিয়ে তিনি আবার যাত্রা শুরু করেন.

মদীনাবাসী এদিকে তাঁর শুভাগমনের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন. প্রতি দিন তাঁরা মদীনার বাইরে প্রতীক্ষায় থাকতেন. যে দিন তাঁর আগমন হয়, সে দিন সবাই পুলকিত হৃদয়ে তাঁকে সাদর সম্ভাষণ জানান. তিনি মদীনার নিকটে কুবা নগরীতে যাত্রা বিরতি করেন. সেখানে চার দিন অবস্থান করেন. তিনি এ সময়ে কুবা মসজিদের ভিত্তি স্থাপন করেন. আর এটাই ইসলামের প্রথম মসজিদ. ৫ম দিনে তিনি মদীনার পথে যাত্রা শুরু করেন. অনেক আনসারী সাহাবী রাসূলুল্লাহ ﷺকে অতিথি হিসাবে বরণ ক'রে ধন্য হওয়ার চেষ্টা করেন এবং তার উটের লাগাম ধরেন. তিনি ﷺ তাঁদের শুকরিয়া আদায় করে বলেন, "উট ছেড়ে দাও, সে নির্দেশ প্রাপ্ত". আল্লাহর নির্দেশ যেখানে হল সেখানে গিয়ে উট বসে যায়. তিনি অবতরণ না করতেই উঠে সে অগ্রভাগে কিছু পথ চলে আবার পিছনে এসে প্রথম স্থানে বসে যায়. সেটাই ছিল মসজিদে নববীর স্থান. তিনি ﷺ আবূ আইয়্যুব আনসারীর অতিথি হোন. আলী ইবনে আবূ তালিব নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) হিজরতের পর তিন

দিন মক্কায় অবস্থান করেন. এ সময়ে তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট রক্ষিত মানুষের আমানত তাদের প্রাপকদের কাছে পৌঁছিয়ে দেন. অতঃপর কুবায় রাসূলের সাথে মিলিত হোন.

রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনায়

উট যেখানে বসে গিয়েছিলো সে জায়গাটি প্রকৃত মালিক থেকে কেনার পর সেখানে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর মসজিদ নির্মাণ করেন. মুহাজির (মক্কা থেকে আগত রাসূলের সাহাবী) ও আনসার (মুহাজিরদের সাহায্যকারী মদীনাবাসী)দের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করেন. প্রত্যেক আনসারীর জন্য একজন মুহাজির ভাই দেয়া হয়. সে তাঁর ধন-সম্পদের অংশীদার হত. মুহাজির ও আনসারী কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করেন. ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক গভীর ও সুদৃঢ় হয় এবং মদীনায় ইসলাম সম্প্রসারিত হতে লাগে. কিছু ইয়াহুদী ইসলাম গ্রহণ করে. তাদের মধ্যে থেকে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিলো, তাদের মধ্যে একজন হলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম ﷺ. তিনি ছিলেন তাদের পন্ডিত এবং তাদের বড় বড় সর্দারদের একজন.

মক্কা থেকে মুসলিমদের হিজরত করার পরও মক্কার কাফেররা তাঁদেরকে ইসলাম থেকে বাধা দানের পথ থেকে সরে দাঁড়ায়নি. যেহেতু মদীনার ইয়াহুদীদের সাথে কুরাইশদের সম্পর্ক ছিল. ফলে তারা তাদের (ইয়াহুদীদের) দ্বারা মুসলিদের মাঝে বিশৃংখলা, নৈরাজ্য ও কলহ-বিবাদ সৃষ্টির পাঁয়তারা চালাতো. কুরাইশরা মুসলিমদের নিশ্চিহ্ন করার হুমকিও প্রদর্শন করতো. এ ভাবে বিপদ ও আশঙ্কা মুসলিমদেরকে ভিতর ও বাহির থেকে ঘিরে ছিল.

পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছে ছিলো যে, সাহাবায়ে কেরাম রাতে ঘুমাবার সময় অস্ত্র রাখতে বাধ্য হয়েছিলেন. এমন বিপজ্জনক ও বিপদসংকুল পরিস্থিতিতে মহান আল্লাহ সশস্ত্র যুদ্ধের অনুমতি দেন. তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ শত্রুদের তৎপরতা জানার লক্ষ্যে সামরিক মিশন চালানো আরম্ভ করেন. অনুরূপ শত্রুদের উপর চাপ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে তাদের বাণিজ্যিক কাফেলার পিছু নিতে ও তাতে প্রতিরোধ সৃষ্টি করতে লাগলেন, যাতে তারা মুসলিমদের শক্তির কথা উপলব্ধি করে শান্তি ও সন্ধি প্রক্রিয়ায় এসে ইসলাম প্রচারের স্বাধীনতায় ও তা বাস্তবায়নে কোন ধরণের বিঘ্ন না ঘটায়. এমন কি কতিপয় গোত্রের সাথে মৈত্রী চুক্তি ও দ্বি-পাক্ষিক চুক্তিও স্বাক্ষরিত হয়.

বদরের যুদ্ধ

মক্কার মুশরিকরা মুসলিমদের উপর সংকীর্ণতা সৃষ্টি করে এবং তাঁদের উপর এমন নির্যাতন ও নিপীড়ন চালায় যে, তাঁরা তাঁদের শহর মক্কা থেকে হিজরত করতে বাধ্য হোন. তাঁরা নিজেদের মাতৃভূমি এবং ধন-সম্পদ ত্যাগ করেন. তাঁদের ছেড়ে আসা ধন-সম্পদ মুশরিকদের হাতে চলে যায়. একবার তিনি কুরাইশের এক বাণিজ্যিক কাফেলার পথ রোধ করার পরিকল্পনা নিয়ে তিন শত তের জন সাথী সহ বের হোন. তাঁদের সাথে২টি ঘোড়া ৭০টি উট ছাড়া কিছুই ছিলো না. আবূ সুফিয়ানের নেতৃত্বে কুরাইশদের বাণিজ্য কাফেলায় উট ছিলো ১০০০ এবং৪০ জন লোক. আবূ সুফিয়ান মুসলিমদের বের হওয়ার ব্যাপারটা জেনে যায়. তাই জরুরী

ভিত্তিতে এক লোক পাঠিয়ে মক্কায় খবর দেয় এবং সাহায্যের আবেদন জানিয়ে রাস্তা পরিবর্তন ক'রে অন্য পথ ধরে. ফলে মুসলিমরা তাদেরকে ধরার সফলতা থেকে বঞ্চিত হোন. অন্য দিকে কুরাইশরা এ খবর পেয়ে ১০০০ যোদ্ধা নিয়ে বের হয়ে পড়ে. আবূ সুফিয়ানের দূত এসে তাদেরকে কাফেলার নিরাপদে ফিরে আসার খবর জানিয়ে মক্কায় ফিরে যাবার অনুরোধ জানায়. কিন্তু আবূ জেহেল ফিরে যেতে অস্বীকার করে এবং যোদ্ধারা বদর নামক স্থান পর্যন্ত যাত্রা অব্যাহত রাখে.

কুরাইশদের বের হবার কথা জেনে রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবায়ে কেরামদের সাথে পরামর্শ করলে সবাই কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার মত প্রকাশ করেন. হিজরী ২য় সনে রমযান মাসের কোন এক প্রভাতে উভয়দল মুখোমুখি হয় এবং তুমুল যুদ্ধ চলে. মুসলিমরা বিপুল ভাবে জয়লাভ করেন. তাদের মধ্যে ১৪জন শাহাদতের অমিয় সুধা পান করেন.৭০ জন কাফের নিহত এবং ৭০জন গ্রেফতার হয়. যুদ্ধকালীন নবীর কন্যা ও উসামান ইবনে আফ্ফান ﷺ র স্ত্রী রুকাইয়া মৃত্যু বরণ করেন. হজরত উসমান ﷺ রাসূলের নির্দেশে তাঁর রোগাক্রান্ত স্ত্রীর পরিচর্যা ও দেখা-শুনার জন্য মদীনায় থেকে যাওয়ার ফলে বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে পারেন নি. যুদ্ধের পরে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর আর এক মেয়ে উম্মে কুলসুমের সাথে উসমানের বিয়ে দেন. তাই তাঁর উপাধি ছিল "যুন্নূরাইন". কারণ তিনি রাসূলের দু' কন্যা বিয়ে করেন.

যুদ্ধ শেষে মুসলিমরা আল্লার সাহায্যে উল্লসিত ও আনন্দিত হয়ে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন. সাথে ছিল যুদ্ধ বন্দী ও মালে গনিমত.

যুদ্ধ বন্দীদের মধ্যে কিছু লোককে মুক্তিপণের বিনিময়ে, আবার অনেককে এমনিতে মুক্তি দেয়া হয়.তাদের মধ্যে কিছু লোকের মুক্তি পণ ছিলো মুসলিমদের ১০জন ছেলেকে লেখা পড়া শিখিয়ে দেয়া. মুশরিকদের বড় বড় অনেক সর্দার এবং ইসলামের বহু শত্রু এই যুদ্ধে মারা যায়. তাদের মধ্যে হলো, আবূ জেহেল, উমায়্যা ইবনে খালাফ, উতবা ইবনে রাবীয়া এবং শাইবা ইবনে রাবীয়া প্রমুখ.

নবী করীম ﷺ কে হত্যা করার ষড়যন্ত্র

বদর যুদ্ধে কুরাইশরা দারুনভাবে পরাজিত হওয়ার পর একদিন উমায়ের ইবনে অহাব সাফওয়ান ইবনে উমায়্যার সাথে বসেছিলো. আর উমায়ের ইবনে অহাব কুরাইশ শয়তানদের একজন ছিলো. নবী করীম ﷺ ও তাঁর সাথীদেরকে যন্ত্রণা দেওয়ার ব্যাপারে সে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতো. তার ছেলে অহাব বদর যুদ্ধের অন্যান্য বন্দীদের সাথে মুসলিমদের হাতে বন্দী হয়েছিলো. সাফওয়ান বদর যুদ্ধে নিহতদের কথা উল্লেখ ক'রে বললো, আল্লাহর শপথ! এর পর আমাদের বেঁচে থাকার মধ্যে কোন আকর্ষণ নেই. তখন উমায়ের বললো, তুমি ঠিকই বলেছো. দেখ, আমার যদি ঋণ না থাকতো যা পরিশোধ করার মত অবস্থা বর্তমানে আমার নেই এবং আমার অভাবে আমার ছেলে-মেয়েদের নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্ক যদি না থাকতো, তবে আমি বাহনে আরোহণ ক'রে মুহাম্মাদের কাছে যেতাম এবং তাঁকে হত্যা করতাম. সাফওয়ান এটাকে মহৎ এক সুযোগ হিসাবে গ্রহণ ক'রে বললো, তোমার ঋণের যিম্মাদার আমি হচ্ছি. আর তোমার

পরিবারকে আমার পরিবারের সাথে ততদিন পর্যন্ত আমি দেখাশুনা করবো, যতদিন তারা বেঁচে থাকবে. তখন উমায়ের তাকে বললো, ব্যাপারটা যেন তোমার ও আমার মাধ্যে গোপন থাকে. সে (সাফওয়ান) বললো, তাই হবে.

অতঃপর উমায়ের তার তরবারীকে তীব্র বিষে সিক্ত করলো. তারপর সে মদীনায় পৌঁছলো. এদিকে উমার ইবনে খাত্তাব ﷺ কিছু সাহাবী সহ কথোপকথন করছিলেন. যখন তিনি দেখলেন যে, অহাব ইবনে উমায়ের গলায় তরবারী ঝুলিয়ে মসজিদের দ্বারদেশে স্বীয় উঁট থেকে অবতরণ করছে, তখন তিনি বললেন, এতো অহাব ইবনে উমায়ের, কোন মন্দ পরিকল্পনা নিয়েই সে এসেছে. অতঃপর উমার ﷺ রাসূলু- ল্লাহ ﷺ-এর কাছে প্রবেশ ক'রে বললেন, হে আল্লাহর নবী! অহাব ইবনে উমায়ের গলায় তরবারী ঝুলিয়ে এসেছে. তিনি ﷺ বললেন, "তাকে আমার কাছে নিয়ে এসো." তাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে নিয়ে যাওয়া হলো. উমার ﷺ তাকে শক্ত করে ধরে ছিলেন. রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে দেখে বললেন, "উমার ওকে ছেড়ে দাও." উমায়েরকে তাঁর কাছে আসতে বললেন. সে তাঁর কাছে এগিয়ে এলো. এরপর তিনি ﷺ বললেন, "উমায়ের কি মনে করে এসেছো?" সে বললো, আমি আপনার হাতে এই বন্দীর ব্যাপার নিয়ে এসেছি. আপনি তার প্রতি দয়া করুন! তখন তিনি ﷺ বললেন, তাহলে তরবারী তোমার গলায় ঝুলানো কেন?" তরবারীর মন্দ হোক, সে কি আপনার কোন ক্ষতি করতে পেরেছে? তিনি ﷺ বললেন, সত্য করে বলো তুমি কেন এসেছো? সে বললো,

আমি এ ছাড়া অন্য কারণে আসিনি. তিনি ﷺ বললেন, "বরং তুমি ও সাফওয়ান বসে বদর যুদ্ধে নিহতদের কথা আলোচনা করছিলে. এক পর্যায় তুমি বললে, আমার উপর যদি ঋণ ও সন্তান-সন্ততির ভার না থাকতো, তাহলে আমি (মদীনায়) গিয়ে মুহাম্মাদকে হত্যা করতাম. তখন সাফওয়ান ইবনে উমায়্যা তোমার ঋণের এবং তোমার পরিবারের দায়িত্ব এই মর্মে গ্রহণ করে যে, তুমি তার জন্য আমাকে হত্যা করবে. কিন্তু আল্লাহ তোমার ও তোমার ষড়যন্ত্রের মাঝে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ালেন.

উমায়ের বললো, আমি সাক্ষি দিচ্ছি যে, আপনি সত্যিকার রাসূল. পূর্বে যে আসমানী খবরা-খবর নিয়ে আপনি আমাদের কাছে আসতেন এবং যে অহী আপনার উপর নাযিল হতো, সে ব্যাপারে আমরা আপনাকে মিথ্যা ভাবতাম. কিন্তু এ ব্যাপারটা আমি আর সাফওয়ান ছাড়া কেউ জানে না. আল্লাহর শপথ! আমার দৃঢ় বিশ্বাস এ খবর আপনাকে আল্লাহই জানিয়েছেন. অতএব, সেই আল্লাহরই প্রশংসা যিনি আমাকে ইসলামের পথ দেখিয়েছেন এবং এ পথে আমাকে নিয়ে এসেছেন. অতঃপর সে সত্যের সাক্ষ্য দিলো.

রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন বললেন, "তোমাদের এই ভাইকে দ্বীনের কথা এবং কুরআনের শিক্ষা দাও ও তার বন্দীকে ছেড়ে দাও." সাহাবীরা তা-ই করলেন. তারপর উমায়ের বললো, আমি ইসলামের চরম বিরোধিতা করেছি এবং আল্লাহর দ্বীন অবলম্বনকারীদের উপর নির্মম অত্যাচার চালিয়েছি. এখন আমি চাই আপনি আনুমতি দিন, মক্কায় গিয়ে তাদেরকে আল্লাহর প্রতি,

তাঁর রাসূলের প্রতি এবং ইসলামের প্রতি দাওয়াত দিই. তিনি ﷺ তাকে অনুমতি দিলেন. সে তখন মক্কায় চলে গেলো.

এদিকে উমায়েরের মক্কা থেকে বের হওয়ার পর সাফওয়ান লোকদের বলে বেড়াতো যে, তোমরা এমন এক শুভ সংবাদ শুনবে যা তোমাদেরকে বদরের ঘটনা ভুলিয়ে দিবে. সে উমায়েরের ব্যাপারে (মদীনা থেকে) আগত ব্যবসায়ীদের জিজ্ঞাসা করতো. এইভাবে ব্যবাসায়ীদের একটি দলকে সে তার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তারা তার ইসলাম গ্রহণের খবর জানিয়ে দিলো. তখন সে শপথ গ্রহণ করলো যে, তার সাথে কখনোও কথা বলবে না এবং তার কোন উপকারও করবে না. উমায়ের ﷺ মক্কায় এসে লোকদেরকে ইসলামের প্রতি দাওয়াত দেওয়ার কাজ আরম্ভ করলে অনেক মানুষই তাঁর হাতে ইসলাম গ্রহণ করে.

অন্য আর একটি ঘটনা

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সাথীদেরকে নিয়ে কোন এক সফর থেকে প্রত্যাবর্তন করছিলেন. এক উপত্যকায় অবতরণ করলেন. সাহাবীরা গাছের ছায়ায় নিদ্রা যাওয়ার জন্য একে অপর থেকে পৃথক হয়ে গেলেন. রাসূলুল্লাহ ﷺও একটি গাছের ছায়াতলে শুয়ে গেলেন এবং তাঁর তর- বারীটা গাছের ডালে ঝুলিয়ে দিলেন. তিনি শুয়ে ছিলেন এমন সময় মুশরিকদের এক ব্যক্তি যে অনেক দূর থেকেই তাঁদের অনুসরণ করছিলো, অতি গোপনে সেখানে এসে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে তাঁর মাথায় কাছে দাঁড়ালো. তিনি ﷺ শুয়েই ছিলেন. অতঃপর তরবারীটা নিয়ে কোষমুক্ত ক'রে নবী করীম ﷺ-এর

মাথার উপর তুলে ধরে বললো, হে মুহাম্মাদ তোমাকে আমার হাত থেকে কে রক্ষা করবে? তিনি ﷺ তাঁর চোখ খুলে দেখলেন এক ব্যক্তি উলঙ্গ তরবারী হাতে তাঁর (মাথার) কাছে দাঁড়ানো. তিনি অতি শান্ত স্বরে বললেন, 'আল্লাহ.' (এ কথা শুনা মাত্রই) লোকটি কেঁপে উঠলো এবং তার হাত থেকে তরবারীটা খসে পড়লো. এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ উঠে তরবারীটা হাতে নিয়ে লোকটির উপর তুলে ধরে বললেন, "তোমাকে এখন আমার হাত থেকে কে রক্ষা করবে?" লোকটি হতভম্ব হয়ে গেলো, কি বলবে খুঁজে পাচ্ছে না. শেষে বললো, কেউ বাঁচাবার নেই. রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে মাফ করে দিলেন. ফলে সে ইসলাম গ্রহণ করলো. অতঃপর তার গোত্রের লোকদের কাছে গিয়ে তাদেরকেও ইসলামের দাওয়াত দিতে লাগলো.

ওহুদের যুদ্ধ

বদর যুদ্ধের এক বছর পর মুসলিম ও মক্কার কাফেদের মধ্যে এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়. মুশরিকরা বদর যুদ্ধের পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণ করার দৃঢ় পরিকল্পনা নিয়ে ৩০০০ যোদ্ধা সহ বের হয়. মুসলিমদের প্রায় ৭০০ মুজাহিদ তাদের মোকাবেলার জন্য মুখোমুখি হোন. যুদ্ধের প্রথম পর্যায়ে মুসলিমরা বিজয়ী হোন এবং তাদের উপর জয়লাভ করেন. মুশরিকরা মক্কার দিকে পশ্চাদ্ধাবন করে. কিন্তু পরে পাহাড়ের দিক দিয়ে এসে মুসলিমদের ধ্বংস সাধন করতে আরম্ভ করে. এতে মুশরিকরা জয়লাভ করে. যখন তীরন্দাজরা দেখলেন যে, মুশরিকরা পলায়ন করেছে, তখন তাঁরা পাহাড়ের সে ঘাঁটি খালি ছেড়ে গনী-মতের মাল জমা করার জন্য নীচে অবতরণ করেন,

যেখানে তাঁদেরকে রাসূলুল্লাহ ﷺ সুপরিকল্পিতভাবে নিযুক্ত করে ছিলেন. ফলে এ যুদ্ধে মুশরিকদের পাল্লা ভারী হয়ে যায়. এ যুদ্ধে ৭০জন সাহাবী শহীদ হোন. তাঁদের মধ্যে একজন হলের, নবীর চাচা হামায ﷺ. আর মুশরিকদের ২২জন ব্যক্তি নিহত হয়.

খন্দক বা পরিখা যুদ্ধ

ওহুদ যুদ্ধের পর মদীনার কিছু ইয়াহুদী মক্কায় গিয়ে মক্কাবাসীকে মুসলিম-দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার উস্কানি দেয় এবং নিজেদের সমর্থন, সাহায্য-সহযোগিতা করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করে. ফলে কাফেররা ইতিবাচক সাড়া দেয়. মুশরিকরা প্রত্যেক এলাকা থেকে মদীনা অভিমুখে রওয়ানা দেয়. প্রায় ১০,০০০যোদ্ধা সমবেত হয়. নবী ﷺ শত্রুপক্ষের তৎপরতার কথা জেনে সাহাবীদের সঙ্গে পরামর্শ করেন. সালমান ফারসী ﷺ মদীনার যে দিকে পাহাড় নেই, সে দিকে পরিখা খননের পরামর্শ দেন. সব মুসলিম উদ্যম ও প্রেরণা সহকারে পরিখা খননে অংশ গ্রহণ করেন এবং কাজ সত্বর সমাপ্ত হয়. মুশরিকরা এক মাস পর্যন্ত অবস্থান করেও পরিখা অতিক্রম করতে সক্ষম হয় নি. অবশেষে আল্লাহ তা'য়ালা প্রচন্ড বাতাস প্রেরণ ক'রে কাফেরদের তাঁবুসমূহ উপড়ে ফেলেন. তারা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে এবং শীঘ্রই নিজ নিজ শহরে ফিরে যায়. মুশরিক দলকে আল্লাহই পরাজিত করেন এবং তিনিই মুসলিমদের সাহায্য করেন. মুশরিক সৈন্যরা পালিয়ে গেলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সাহাবীদেরকে জানিয়ে দেন যে, "এ বছররের পর থেকে কুরাইশরা আর কখনোও তোমাদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য আসবে না, বরং তোমরা এবার

তাদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য যাবে." তিনি ﷺ ঠিকই বলেছিলেন, এই যুদ্ধই ছিলো কুরাইশদের সর্বশেষ আক্রমণ.

পরিখা খননকালে মুসলিমরা অতীব ক্ষুধার শিকার হোন. এমন কি ক্ষুধার তীব্র জ্বালায় তাঁদেরকে পেটে পাথর বাঁধতে হয়. তাই জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ ﷺ নবী করীম ﷺ-এর জন্য প্রাণ সঞ্চারের মত সামান্য কিছু পেশ করার ইচ্ছা করেন. তিনি ছাগলের একটি বাচ্চা জবাই করেন যা তাঁর কাছে ছিলো. তাঁর স্ত্রীকে গোশ্ত পাক করতে এবং তার সাথে সামান্য যবের আটা দিয়ে রুটি তৈরী করতে বলেন. এ ছাড়া তাঁর কাছে আর কিছুই ছিলো না. যখন খানা তৈরী হয়ে গেলো তিনি নবী করীম ﷺ-এর কাছে গিয়ে তাঁকে খবর দিলেন যে, সামান্য পরিমাণ খানা তৈরী করা হয়েছে যা আপনার এবং আপনার সাথে একজন বা দু'জনের জন্যই যথেষ্ট হবে. রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "অনেক উত্তম." অতঃপর তিনি ﷺ সমস্ত পরিখাবাসীদের ডাক দিয়ে তাঁদের জন্য গোশ্ত তুলে এবং রুটি ছিঁড়ে ছিঁড়ে দিতে লাগলেন. তাঁরা সকলে খেয়ে পরিতৃপ্ত হয়ে গেলেন. খাবার যা অবশিষ্ট ছিলো তা দেখে মনে হচ্ছিলো তাতে হাতই লাগানো হয়নি. সাহাবীরা ছিলেন প্রায় এক হাজার জন. এটা ছিলো নবী করীম ﷺ-এর মু'জিযাসমূহের একটি মু'জিযা.

হুদায়বিয়ার সন্ধি

রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং সাহাবীরা যখন থেকে মদীনায় হিজরত করে ছিলেন, তখন থেকে মক্কার কাফেররা দৃঢ় পরিকল্পনা নিয়ে রেখেছিলো যে, তাঁদেরকে আর কোন দিন মক্কা প্রবেশ করতে এবং

হারাম শরীফের যিয়ারত করতে দিবে না. কিন্তু হিজরতের ৬ষ্ট সনে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সাথীদেরকে নিয়ে মক্কা যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন. যুল-ক্বাআদা মাসে বের হওয়ার দিন স্থির করলেন. আর এটা ছিলো সেই হারাম মাসগুলোর একটি মাস, আরবরা যার সম্মান করে. তাই উমরা করার উদ্দেশ্যে বের হলেন, যুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে নয়. মুসলিমদের সংখ্যা ছিলো এক হাজার চার শ' (১৪০০). তাঁরা সবাই ইহরামের কাপড় এবং কুরবানীর পশু সাথে করে নিয়ে বের হলেন. তাঁরা উমরার নিয়তও করলেন, যাতে লোকেরা জেনে নেয় যে, তাঁরা বায়তুল্লাহর যিয়ারত এবং তার সম্মান প্রদর্শনের জন্য বের হয়েছেন. আর যাতে কুরাইশরা তাঁদেরকে মক্কায় প্রবেশ করতে বাধা না দেয়. অনুরূপ তাঁরা নিরস্ত্রও ছিলেন. কেবল কোষবদ্ধ একটি করে তরবারী তাঁদের সাথে ছিলো যা প্রত্যেক মুসাফির সাথে করে নেয়.

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর 'ক্বাসওয়া' নামক উটনীর উপর আরোহন করলেন এবং সাহাবীরা ছিলেন তাঁর পিছনে. যখন তাঁরা মদীনাবাসীদের মীক্বাত হুলাইফায় পৌঁছলেন, তখন সকলেই উমরার নিয়ত ক'রে তালবিয়্যার ধ্বনি উচ্চারণ করতে লাগলেন উমরার ঘোষণা দেওয়ার জন্য. আর এটা ছিলো তাঁদের অধিকারের জিনিস. কারণ, বায়তুল্লাহর যিয়ারতের অধিকার সকলের আছে. প্রচলিত সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী কাউকে বায়তুল্লাহর যিয়ারত ও তার তাওয়াফ করতে বাধা দেওয়ার অধিকার কুরাইশদের নেই. যদিও সে কোন শত্রু হয় তবুও, যখন সে এই ঘরের সম্মানের খেয়াল রাখবে. কিন্তু কুরাইশরা কেবল এ কথা জেনেই যে মুসলিমরা

মক্কা অভিমুখে যাত্রা করছেন, যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু করে দিলো এবং নবী করীম ﷺকে মক্কায় প্রবেশ করতে বাধা দেওয়া দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করলো. এর জন্য যা করার সবই তারা করবে. কুরাইশদের এই ধরনের পদক্ষেপ মুলিমদের প্রতি তাদের শত্রুতা, তাঁদের উপর ওদের অত্যাচার এবং তাঁদেরকে বৈধ অধিকার থেকে বঞ্চিত করার কথাই প্রমাণ করে. রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর যাত্রা অব্যাহত রাখলেন এবং তিনি মক্কার প্রায় কাছাকাছি পৌঁছে গেলেন. এদিকে কুরাইশরা তাঁকে এবং তাঁর সাথীদেরকে মক্কায় প্রবেশ করতে এবং বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করতে না দেওয়ার ব্যাপারে ছিলো বদ্ধপরিকর. শুরু হলো মুহাম্মাদ ﷺ-এর কাছে মধ্যস্থকারীদের আগমন কোন সুরাহা বের করার জন্য. উভয় পক্ষের প্রতিনিধিগণ বারংবার যাতায়াত করতে লাগলো. আর কুরাইশদের চল্লিশজন যুবক আকস্মিকভাবে মুসলিমদের উপর আক্রমন করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবীদের কোন একজনকে হত্যা করার জন্য. কিন্তু মুসলিমরা তাদের সকলকে পাকড়াও করতে সক্ষম হোন এবং তাদেরকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে নিয়ে আসেন. রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে ক্ষমা ক'রে ছেড়ে দেন.

অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ উসমান ﷺকে কুরাইশ নেতৃবৃন্দের কাছে প্রেরণ করেন তাদেরকে এই সংবাদ দেওয়ার জন্য যে, তিনি ﷺ যুদ্ধ করার জন্য আসেননি. তিনি ﷺ বায়তুল্লাহর সম্মানার্থে কেবল তার যিয়ারত করার জন্য এসেছেন. কুরাইশ ও উসমান ﷺ-এর আলোচনা ব্যর্থ হয়. কুরাইশগরা তাঁকে (উসমান ﷺ কে) তাদের

কাছে আটকে রাখে ফলে তাঁর হত্যা হওয়ার ভুয়া খবর রটে যায়. রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এ সংবাদ পৌঁছলে তিনি প্রতিজ্ঞা করেন যে, উসমান ﷺ র প্রতিশোধ না নেওয়া পর্যন্ত এখান থেকে আমরা যাবো না এবং তিনি মানুষের কাছে বায়াত গ্রহণ করেন. তিনি তাঁর একটি হাতকে অপর হাতের উপরে রাখলেন. আর এই বায়াকে 'রিযওয়ান' নামে নামকরণ করা হয়. একটি গাছের নীচে এ বায়াত সুসম্পন্ন হয়. এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবীদের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি নেন যে, যদি আসলেই উসমানের কোন ক্ষতি হয়ে থাকে, তবে মুশরিকদের সাথে যুদ্ধ না করা পর্যন্ত কেউ তার স্থান থেকে নড়বে না এবং পালায়নও করবে না. অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে খবর এলো যে, উসমান ﷺ ভালো আছেন এবং তাঁকে হত্যা করা হয়নি.

এদিকে কুরাইশরা যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মুসলিমদের কাছ থেকে যুদ্ধ করার উপর বায়াত গ্রহণ করার কথা জানতে পারলো, তখন অতি সত্বর সুহেল ইবনে আমরকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে এই সন্ধি করার জন্য পাঠায় যে, মুসলিমরা এ বছর ফিরে যাক এবং পরে যখনই চাইবে, তখনই তারা আসতে পারবে. সন্ধিচুক্তি সুসম্পন্ন হয়ে গোল. রাসূলুল্লাহ ﷺ সন্ধির সেই শর্তগুলো মেনে নিলেন, বাহ্যতঃ যেগুলো কুরাইশদের স্বার্থেরই মনে হচ্ছিলো. মুসলিমরা এ রকম সন্ধিতে চরম রাগান্বিত হোন. তাঁরা সচক্ষে দেখছিলেন অবিচারমূলক এমন শর্তাবলী, যা ছিলো মুশরিকদেরই স্বার্থের অনুকুলে. কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ সন্ধি চাইছিলেন. কারণ, তিনি ﷺ জানতেন যে, স্থিরতা ও শান্তির সাথে ইসালামের প্রচার চললে

তাতে বহু মানুষই প্রবেশ করবে. আর হলোও তা-ই. সন্ধির এই সময়কালে মানুষের মাঝে ইসলাম আশাতীত ভাবে সম্প্রসারিত হয়. শুধু এটাই নয়, বরং মুসলিম ও কুরাইশদের মাঝে এই সন্ধিই ছিলো ইসলাম ও মুসলিমদের জন্য বড়ই বিজয়. আর এ থেকে এ কথাও প্রমাণ হয় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহর জ্যোতি দিয়ে দেখেন. তাই তিনি ﷺ সমস্ত এই শর্তাবলীকে মেনে নেন, যেগুলোকে কোন কোন সাহাবী বাহ্যিকভাবে কুরাইশদের স্বার্থেরই অনুকুলে মনে করছিলেন.

মক্কা বিজয়

হিজরি ৮ম সনে রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কা বিজয় অভিযান চালানোর ইচ্ছা করেন. ১০ই রমযান ১০০০০ সদস্যের বাহিনী নিয়ে মক্কা অভিমুখে রওয়ানা হোন. মক্কায় উল্লেখ যোগ্য কোন যুদ্ধ ছাড়াই প্রবেশ করেন. কুরাইশরা আত্মসমর্পণ করে. আল্লাহ তা'য়ালা মুসলিমদেরকে বিজয় দান করেন. নবী করীম ﷺ মসজিদে হারামের অভিমুখে রওনা করেন এবং কা'বা শরীফের তাওয়াফ ক'রে কা'বার অভ্যন্তরে দু'রাকাআত নামায আদায় করেন. অতঃপর কা'বার ভিতরে ও উপরে রাখা সব মূর্তি চূর্ণ বিচূর্ণ করেন. তারপর কা'বাশরীফের দরজায় দাঁড়িয়ে মসজিদে হারামে কাতার বদ্ধভাবে অপেক্ষারত সমবেত কুরাইশদেরকে বলেন, "হে কুরাইশরা! তোমাদের সাথে কি আচরণ করবো বলে মনে করো"? তারা বলে, ভালো আচরণ, সম্ভ্রান্ত ভাই, সম্ভ্রান্ত ভাইয়ের পুত্র. তিনি বলেন, "যাও তোমরা সবাই মুক্ত". রাসূলুল্লাহ ﷺ ক্ষমার উজ্জ্বল ও বৃহত্তম

দৃষ্টান্ত পেশ করেন. তারাই সেই লোক যারা তাঁর সাহাবাদের উপর চালিয়ে ছিল অত্যাচরের স্টীম রোলার, তাঁদের কষ্ট দিয়েছে এবং তাঁকে (রাসূলুল্লাহ ﷺ কে) নিজের মাতৃভূমি থেকে বহিষ্কার করেছে.

মক্কা বিজয়ের পর লোক জন দলে দলে আল্লাহর দ্বীনের ছায়াতলে সমবেত হয়. হিজরি ১০ম সনে রাসূলুল্লাহ ﷺ হজ্জ করেন. এটাই ছিলো তাঁর এক মাত্র হজ্জ. তাঁর সাথে এক লাখ লোক হজ্জ করেন. হজ্জ পালন শেষে তিনি মদীনায় প্রত্যাগমন করেন.

প্রতিনিধি দলের আগন এবং বাদশাহদের নিকট পত্র প্রেরণ

নবী করীম ﷺ-এর আনীত বিষয়ের বিকাশ ঘটলে এবং তাঁর দাওয়াত বিস্তার লাভ করলে প্রত্যেক স্থান থেকে দলে দলে মানুষ মদীনা অভিমুখে আসতে লাগলো এবং ইসলামে প্রবেশের ঘোষণা দিতে লাগলো.

অনুরূপ তিনি ﷺ বাদশাহদের প্রতি পত্র প্রেরণের মাধ্যমে তাদেরকে ইসলামের প্রতি আহ্বান জানাতে লাগলেন. কেউ তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে ঈমান আনলো. কেউ সুন্দরভাবে পত্রের উত্তর দিলো এবং (নবীর) জন্য উপঢৌকনও পাঠালো, কিন্তু ইসলাম গ্রহণ করলো না. আবার কেউ তাঁর পত্রকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে দিলো. যেমন পারস্যের বাদশাহ খুসরু নবী করীম ﷺ-এর পত্রকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে দিয়েছিলো. ফলে তিনি ﷺ তার উপর বদ্দুআ ক'রে বলেছিলেন, "হে আল্লাহ! তার রাজ্যকেও টুকরো টুকরো করে দাও." তাই কিছু দিনের মধ্যেই তার পুত্র তার উপর আক্রমণ ক'রে তাকে হত্যা ক'রে তার কাছ থেকে রাজত্ব কেড়ে নিয়ে ছিলো.

মিসরের বাদশাহ মুক্বাউক্বেস ইসলাম গ্রহণ তো করে নি, তবে সে নবী করীম ﷺ-এর বড়ই সম্মান করেছিলো এবং দূত মারফত নবীর জন্য উপঢৌকন পাঠিয়ে ছিলো. রোম সম্রাট কেসরাও অনুরূপ আচরণ করেছিলো. সেও বড় উত্তম উত্তর দিয়ে ছিলো এবং নবী করীম ﷺ-এর দূতের খুব শ্রদ্ধা করেছিলো. আর বাহরাইনের বাদশাহ মুনযির ইবনে সাওয়ার কাছে যখন নবী করীম ﷺ-এর পত্র পৌঁছে, সে তা পাঠ ক'রে বাহরাইনবাসীদেরকে শুনায়. ফলে কেউ ঈমান আনে এবং কেউ অস্বীকার করে.

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মৃত্যু

হজ্জ থেকে প্রত্যাবর্তনের প্রায় আড়াই মাস পর তিনি ﷺ রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েন. দৈনন্দিন রোগ বেড়ে যায়. (তীব্রভাবে রোগাক্রান্ত হয়ে) ইমামতি করতে অক্ষম হয়ে পড়লে আবূ বাকার ﷺ কে ইমামতি করতে বলেন. হিজরি ১১সনে ১২ই রবিউল আওয়াল সোমবার রাসূলুল্লাহ ﷺ মৃত্যু বরণ ক'রে তাঁর মহান সাথীর কাছে যাত্রা করেন. তখন তাঁর বয়স হয়েছিলো ৬৩ বছর.এ খবর শুনে সাহাবায়ে কেরাম প্রায় জ্ঞান ও স্বস্তি হারিয়ে ফেলেছিলেন.এ খবর বিশ্বাস করতে পার ছিলেন না. এহেন সময় আবূ বাকার সিদ্দীক ﷺ এক ভাষণে লোক জনকে শান্ত করেন. তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক জন মানুষ ছিলেন. যিনি মৃত্যু বরণ করেছেন, যেমন অন্যান্য মানুষ মৃত্যু বরণ করে. মানুষ শান্ত হয়ে যায়. রাসূলের গোসল দেয়া, কাফন পরানো ও তাঁর স্ত্রী আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)র হুজরাতে দাফন করা সম্পূর্ণ হলো. রাসূলুল্লাহ

ﷺ নবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্বে চল্লিশ বছর ও পরে তের বছর মক্কায় এবং দশ বছর মদীনায় জীবনযাপন করেন.

অতঃপর মুসলিমরা সকলের ঐক্যমতে আবূ বাকার ﷺকে নিজেদের খলিফা নির্বাচন করেন. তিনি ছিলেন খোলাফায়ে রাশেদীনদের মধ্যে প্রথম.

নবী করীম ﷺ-এর প্রতি সাহাবীদের ভালোবাসা

নবী করীম ﷺ-এর প্রতি সাহাবীদের ভালোবাসা ছিলো অতি মহান. তাঁরা তাঁকে তাঁদের জান, সন্তান-সন্ততি এবং এমন সকল জিনিস থেকেও বেশী ভালোবাসতেন, যার তাঁরা মালিক ছিলেন. তাঁরই মাধ্যমে আল্লাহ তাঁদেরকে কুফ্‌রির অন্ধকার থেকে ইসলামের জ্যোতির পথে নিয়ে এসেছেন. যে ঘটনাগুলো আমাদেরকে বর্ণনা করে নবী করীম ﷺ-এর প্রতি সাহাবীদের ভালোবাসার কথা, তার সংখ্যা অনেক. তার মধ্য থেকে কয়েকটি ঘটনা তুলে ধরা হচ্ছে.

*যখন কুরাইশগণ এক মহান সাহাবী খুবাইব ইবনে আদী ﷺকে শূলে দেওয়ার জন্য একত্রিত হয়, তখন আবূ সুফিয়ান বললো, তুমি কি এটা পছন্দ করবে যে, মুহাম্মাদ এখন আমাদের কাছে হোক আর আমরা তাঁকে শূলে দিই এবং তুমি (মুক্ত হয়ে) তোমার পরিবারের কাছে থাকো? তখন তিনি বললেন, আমি এটাও চাইবো না যে, আমি (মুক্ত হয়ে) আমার পরিবারের কাছে থাকি আর মুহাম্মাদ ﷺ-এর পায়ে এমন কাঁটা বিদ্ধ হোক যে তাঁকে কষ্ট দিবে.

*ওহুদের যুদ্ধে খবর রটে গেলো যে, নবী করীম ﷺ কে হত্যা করে দেওয়া হয়েছে. এ খবর শুনে এক আনসারী মহিলা (মদীনার)

বাইরে বেরিয়ে আসেন. তাঁকে তাঁর পিতা, পুত্র এবং স্বামী ও ভাইয়ের শহীদ হওয়ার সংবাদ দেওয়া হলে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খবর কি? তাঁকে জানানো হলো যে, তিনি ﷺ ভালোই আছেন. তখন তিনি বললেন, আমাকে দেখাও, আমি তাঁকে দেখতে চাই. যখন তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺকে দেখলেন, তখন তাঁর কাপড়ের একটি কোণা ধরে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য কুরবান হোক, আপনি যখন নিরাপদে আছেন তখন আমার আর কোনই পরোয়া নেই.

*এক ব্যক্তি নবী করীম ﷺ-এর কাছে এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আপনাকে আমার প্রাণ, আমার সন্তান-সন্ততি এবং আমার পিতা-মাতার চেয়েও বেশী ভালোবাসি. আমি বাড়ীতে থাকাকালীন যখনই আপনাকে মনে করি, তখন আপনাকে না দেখা পর্যন্ত আমার ধৈর্য হয় না. কিন্তু যখন আমি আমার ও আপনার মৃত্যুকে স্মরণ করি, তখন আমি এ ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে যাই যে, আপনি জান্নাতে নবীদের সাথে সুউচ্চ মর্যাদায় থাকবেন. আর আমি যদিও জান্নাতে প্রবেশ করি, তবুও আমার আশঙ্কা হয় যে, হয়তো আপনাকে দেখতে পাবো না. তখন নবী করীম ﷺ বললেন, "তুমি তারই সাথে থাকবে, যাকে তুমি ভালো- বাসো."

অমুসলিমদের সাথে নবী করীম ﷺ-এর আচরণ

নবী করীম ﷺ উন্মুক্ত চিত্তে বিভিন্ন সভ্যতা-সংস্কৃতির, বিভিন্ন মতাদর্শে বিশ্বাসী এবং বহু বর্ণের লোকদের সাথে বসবাস করেছেন.কিন্তু তাদের সভ্যতা-সংস্কৃতি নিয়ে কোন সমালোচনা

করনেনি. এর দৃষ্টান্ত হলো, তিনি ﷺ মক্কা থেকে আসার পর থেকেই মদীনার ইয়াহুদীদের সাথে অতীব শান্ত-সুষ্ঠুভাবে বসবাস করেতেন. ইসলামী নৈতিকতা তাদের জন্য তিনি পেশ করতেন. তিনি তাদের রোগীদের দেখতে যেতেন. প্রতিবেশী ইয়াহুদীর মন্দ আচরণ তিনি সহ্য করতেন. কোন ইয়াহুদীর জানাযা দেখলে দাঁড়িয়ে যেতেন. যেমন, এক ইয়াহুদীর জানাযা দেখে তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন. তাঁকে বলা হলো, এতো ইয়াহুদীর জানাযা. তখন তিনি ﷺ বললেন, "এটা কি কোন প্রাণী নয়?"

মদীনায় আসার পর থেকেই তিনি ইয়াহুদীদের সাথে কোন শত্রুতা না রাখার প্রতি ছিলেন বড়ই আগ্রহী. বরং তাদের সাথে তিনি চুক্তি স্বাক্ষর করেন. যা প্রমাণ করে যে তিনি অপর পক্ষের সাথে শান্তিপূর্ণ- ভাবে বসবাস করার প্রতি ছিলেন বড়ই আগ্রহী. ইসলামী দেশের সম্প্রসারণ ঘটলে সেখানে বহু খ্রীষ্টান গোত্র বসবাস করেছে বিশেষ করে নাজরানে. তাদের সাথে নবী করীম ﷺ সুন্দর আচরণ করেছেন. ইসলামী দেশের ছত্রছায়ায় যাতে তারা নিরাপত্তার সাথে বসবাস করতে পারে এর জন্য তিনি তাদেরকে প্রতিশ্রুতিও দান করেছেন. নিজেদের ধর্মের বিধি-বিধান পালন করার স্বাধীনতাও দান করেছেন এবং তাদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা বিধানের দায়িত্বও গ্রহণ করেছেন.

নাজরানবাসীদের নিরাপত্তা দানের চুক্তিনামায় এসেছে যে, "নাজরা- নবাসী এবং তাদের অনুচরবর্গের মালের, জানের, বিষয়-সম্পত্তি, মিল্লাতের এবং তাদের উপস্থিত ও অনুপস্থিত সকলের হিফাযতের যিম্মাদার হলেন আল্লাহ ও মুহাম্মাদ ﷺ. যিনি

আল্লাহর নবী ও তাঁর রাসূল. এইভাবে এই অঙ্গীকার পত্রে নাজরানের খ্রীষ্টানদের অধিকার- সমূহের হিফাযতের এবং তাদের নিরাপত্তার বিঘ্ন না ঘটার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়. অনুরূপ নবী করীম ﷺ কর্তৃক জারী করা মদীনা দস্তবেজে দেশের আইনে অমুসলিমদেরকেও স্বদেশী মুসলিমদের মতই বিবেচনা করা হয়েছে. তাদের জন্যও ছিলো মুসলিমদের ন্যায় অধিকার এবং মুসলিমদের জন্য আবশ্যক পালনীয় যে দায়িত্ব ছিলো তা তাদের উপরেও ছিলো.

আর মুনাফেকদের সাথে নবী করীম ﷺ-এর বসবাসের ব্যাপার হলো, তিনি তাদেরকে তাদের নামসহ জানতেন এবং এও জানতেন যে, তারা মুসলিমদের পরাজয়ের জন্য ও তাদেরকে বিভক্ত করার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, তা সত্ত্বে আমরা দেখি নি যে তিনি তাদের সাথে চলাফেরা করতে অস্বীকার করেছেন. বরং তিনি তাদের সংস্রবে থাকতেন. তাদের সাথে চলাফেরা করতেন এবং তাদের বক্তব্য শুনতেন. অনুরূপ তাদের বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগ করার শক্তি-সামর্থ্য রাখা সত্ত্বেও তিনি এর শরণাপন্ন হোননি. তাদেরকে তাদের ন্যায়াধিকার থেকে বঞ্চিত করা হতো না. মুসলিমদের মত তারা সম্পূর্ণরূপে নাগরিক অধিকার দ্বারা পরিতৃপ্ত হতো. সামাজিক ব্যাপারে তাদেরকেও মতামত পেশ করার অধিকার দেওয়া হতো এবং বায়তুল মাল থেকে তাদেরকেও অংশ দেওয়া হতো. এইভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ ভালোবাসার সাথে ও খুলা দিলে অপরের সাথে বসবাস করতেন. মনে কোন বিদ্বেষ ও ঘৃণা পোষণ করতেন না. বরং তিনি ﷺ তাঁর অনুসারীদেরকেও স্বীয়

আচরণ ও কথার মাধ্যমে অপরের সাথে পরিষ্কার মনে ও শান্তভাবে বসবাস করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করতেন.

মু'মিনরা পরস্পরের ভাই

(হাদীসের) বহু স্থানে নবী করীম ﷺ মুসলিমদের পারস্পরিক ভ্রাতৃত্বের গুরুত্ব এবং তাদের একে অপরের সাথে সম্পর্ক রাখা যে ওয়াজিব তার প্রতি চরমভাবে তাকিদ করেছেন এবং আপসে হিংসা, বিদ্বেষ পোষণ করতে, সম্পর্কচ্ছেদ করতে এবং বিরোধিতা ও ঐক্য ছিন্ন করতে নিষেধ করেছেন. অনুরূপ সেই সব জিনিস থেকে সতর্ক করে দিয়েছেন, যা পারস্পরিক বিদ্বেষ এবং একে অপর থেকে দূরত্ব সৃষ্টির কারণ হয়. এইভাবে তিনি ﷺ অপর মুসলিমের প্রয়োজন পূরণ এবং তার সাহায্য-সহযোগিতা ও তাকে নসীহত করার প্রতি অনুপ্রাণিত করেছেন. আমরা যখন তাঁর কথা-বার্তা, নিদেশাবলী এবং তাঁর কার্যকলাপের প্রতি লক্ষ্য করি, তখন দেখি যে, তাতে রয়েছে মু'মিনদের পারস্পরিক ভালোবাসার সম্প্রসারণের প্রতি উন্মুক্ত আহ্বান. তিনি তাকিদ করে বলেছেন যে, ঈমানী ভালোবাসা হলো জান্নাতের যাওয়ার অসীলা ও তার পথ. যেমন তিনি বলেন,

((لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا، وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، أَوَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ))

অর্থাৎ, "তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না, যতক্ষণ না ঈমান এনেছো. আর ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা ঈমান

আনতে পারবে না, যতক্ষণ না তোমাদের পারস্পরিক ভালোবাসা সৃষ্টি হয়েছে. আমি কি তোমাদেরকে এমন জিনিসের কথা বলে দিবো না যা করলে তোমাদের পারস্পরিক ভালোবাসা সৃষ্টি হবে? (তা হলো) তোমরা আপসে সালামের প্রচলন করো."

তিনি ﷺ সর্বদা মুসলিমদের মাঝে ভালোবাসার বীজ বপন করার এবং তাদের মধ্যে প্রেম-প্রীতি সৃষ্টি করার প্রতি দারুণ আগ্রহী থাকতেন. মানুষের অন্তরে ভালোবাসার ভিত্তি সংস্থাপন করার ব্যাপারেও তিনি ছিলেন চরম আগ্রহী. তিনি আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, আল্লাহর নিমিত্ত মু'মিনদের প্রতি আমাদের ভালোবাসা যতই বেশী হবে, ততই আমরা আল্লাহর ভালোবাসা লাভে ধন্য হবো. যেমন তিনি ﷺ বলেছেন,

((مَا تَحَابَّ رجلان في الله إلاَّ كانَ أَحَبُهُمَا إلى الله– عزوجل – أَشدهُمَا حُبّاً لصاحبه))

অর্থাৎ, "যে দুই ব্যক্তি মহান আল্লাহর নিমিত্ত পরস্পরকে ভালোবাসে, তাদের প্রতি আল্লাহর ভালোবাসা তাদের একে অপরকে ভালোবাসার চেয়েও আরো গভীর হয়." কেবল এ টুকুই নয়, বরং রাসূলুল্লাহ ﷺ বর্ণনা করেছেন যে, ঈমান অপরের সাথে ভালোবাসা রাখা এবং অন্যের জন্য কল্যাণকামিতার সাথে সম্পর্কিত. যেমন তিনি ﷺ বলেছেন,

((لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ))

অর্থাৎ, "তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত মু'মিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে নিজের জন্য যা ভালোবাসে তা তার অপর ভাইয়ের জন্যও ভালো না বাসবে." অনুরূপ আবূ হুরাইরা ﷺ থেকে বর্ণিত. নবী করীম ﷺ বলেছেন, "তোমরা একে অপরের জন্য নম্র হও, তাহলে তোমাদের মধ্যে ভালোবাসা সৃষ্টি হবে." তিনি ﷺ ভালোবাসা সৃষ্টি হওয়ার মাধ্যম ও পথগুলোও জানিয়ে দিয়েছেন. তার মধ্যে হলো নরম হৃদয়ের অধিকারী হওয়া এবং অন্তরকে অপরের ভালোবাসা সম্পূর্ণরূপে অনুভব করার যোগ্য করা.

নবী করীম ﷺ-এর সৃষ্টিগত গুণ

রাসূলুল্লাহ ﷺ মাঝারি গোছের মানুষ ছিলেন. খুব লম্বাও না, অতি খাটোও না. উভয় কাঁধের প্রশস্ততার, সামঞ্জস্যপূর্ণ শারীরিক গঠনের এবং উন্মুক্ত বক্ষের অধিকারী ছিলেন. মানুষের মধ্যে সব চেয়ে সুদর্শন ছিলেন. তাঁর লাল-সাদা মিশ্রিত গোলাকার মুখমন্ডল ছিলো. সুরমা বরণ চোখ, পাতলা নাক, সুন্দর মুখাকৃতি এবং ঘন দাড়ি বিশিষ্ট ছিলেন. তিনি বড়ই সুন্দর সৌরভ এবং নরম ও নাজুক ছিলেন. আনাস ইবনে মালিক ﷺ বলেন, 'আমি মেশ্‌ক আম্বর (কস্তুরী) ও এমন কোন সুগন্ধি শোঁখি নি, যা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চেয়ে অধিক সুগন্ধময় এবং আমার হাত এমন কোন জিনিস স্পর্শ করে নি, যা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাতের চেয়েও অধিক কোমল.' (মুসলিম ২৩৩০) তিনি ছিলেন হাসিমুখো. স্নিগ্ধ হাসির, সুন্দর স্বরের এবং মিতভাষিতার অধিকারী ছিলেন. আনাস ইবনে মালিক ﷺ তাঁর সম্পর্কে বলেন, 'তিনি মানুষের মধ্যে সব থেকে সুন্দর, সব চেয়ে

দানশীল এবং সর্বাপেক্ষা নির্ভীক বীর ও সাহসী ছিলেন.' (মুসলিম ২৩০৭)

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চরিত্র

তিনি সর্বাপেক্ষা নির্ভীক ও সাহসী ছিলেন. আলী ইবনে আবূ তালিব বলেন, যখন তুমুল যুদ্ধ শুরু হতো, এক দল অন্য দলের মুখোমুখি যুদ্ধ করতো, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺকে আড়াল হিসাবে রাখতাম.তিনি সর্বাপেক্ষা দানবীর ছিলেন. কখনো কোন জিনিস চাওয়া হলে তিনি না করেন নি. তিনি সর্বাপেক্ষা ধৈর্যশীল ছিলেন. নিজের জন্য কোন প্রতিশোধ নেন নি এবং নিজের স্বার্থের জন্য কখনো রাগান্বিত হোন নি. তবে হ্যাঁ, আল্লাহর কোন বিধান লংঘন করা হলে আল্লাহর নিমিত্তেই প্রতিশোধ নিয়েছেন. অধিকারের ব্যাপারে তাঁর নিকটে আত্মীয় অনাত্মীয়, দুর্বল, সবল সবাই সমান ছিলো. তিনি গুরুত্ব দিয়ে বলেছেন যে, তাকওয়া ছাড়া আল্লাহর কাছে কেউ কারো চাইতে শ্রেয় নয়. সব মানুষ সমান ও একরূপ. পূর্ববর্তী জাতিগুলো এ জন্য ধ্বংস হয়েছে যে, কোন সম্ভ্রান্ত লোক চুরি করলে তারা তাকে ছেড়ে দিতো, আর কোন দুর্বল ব্যক্তি চুরি করলে শাস্তি দিতো. তিনি বললেন, **"আল্লাহর শপথ! যদি ফাতিমা বিনতে মুহাম্মাদ চুরি করে, তবে আমি তাঁরও হাত কর্তন করবো".**

তিনি কখনো কোন খাবারের দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করেন নি. রুচি সম্মত হলে আহার করতেন. অন্যথায় বর্জন করতেন. কখনো মুহাম্মাদের পরিবারের উপর এমনও সময় আসতো যে, এক মাস

দু'মাস পর্যন্ত তাঁর বাড়ীতে আগুন জ্বলতো না.তিনি ও তাঁর পরিবার শুধু খেজুর ও পানি আহার করেছেন. ক্ষুধার তীব্র জ্বালা প্রশমিত করার জন্য মাঝে মাঝে উদর মুবারকে প্রস্তর বেঁধে রাখতেন. তিনি জুতা সিলাই করতেন. কাপড়ে তালি লাগাতেন. গৃহ কর্মে তাঁর পরিবারবর্গের সহযোগিতা করতেন. অসুস্থ ব্যক্তিদের দেখতে যেতেন. তিনি অতি নম্র ছিলেন. ধনী-গরীব, সম্ভ্রান্ত-অসম্ভ্রান্ত সবার দাওয়াত গ্রহণ করতেন. তিনি ভাল বাসতেন গরীব মিসকীনকে প্রচুর. তাদের জানাযায় হাজির হতেন. পিড়ীত লোকদের দেখতে যেতেন. কোন দরিদ্র ব্যক্তিকে দারিদ্র্যের জন্য ঘৃণা করতেন না. কোন রাজা বা শাসককে তার রাজত্ব ও যশ-ঐশ্বর্যের কারণে ভয় করতেন না. তিনি ঘোড়া, উট, গাধা ও খচ্চরের উপর আরোহণ করতেন.

তিনি সব চাইতে বেশী স্নিগ্ধ হাসতেন. সর্বাপেক্ষা সুদর্শন ছিলেন. অথচ দুঃখ বিপদ অনবরত তাঁর উপর আসতে থাকতো. সুগন্ধ ভাল বাসতেন. দুর্গন্ধ ঘৃণা করতেন. আল্লাহ পাক চারিত্রিক উৎকর্ষ ও সুন্দর কর্মের অনুপম সন্নিবেশ ঘটিয়েছিলেন তাঁর মধ্যে. আল্লাহ তা'য়ালা তাঁকে এমন জ্ঞান দান করেছিলেন যা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী অন্য কাউকে দান করা হয়নি. তিনি ছিলেন নিরক্ষর. জানতেন না লেখা-পড়া. মানুষের মধ্যে কেউ তাঁর শিক্ষক ছিলো না. আল্লাহর কাছ থেকে নিয়ে আসেন মহা গ্রন্থ আল কুরআন, যার সম্পর্কে স্বয়ং আল্লাহ পাক বলেন,

﴿ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيراً ﴾ [الاسراء:٨٨]

অর্থাৎ, "বলুন, যদি মানুষ ও জ্বীন এই কুরআনের অনুরূপ রচনা করার জন্য সমবেত হয় এবং তারা পরস্পরের সাহায্যকারী হয়, তবুও তারা কখনো এর অনুরূপ রচনা করতে পারবে না". (সূরা ইসরাঃ ৮৮) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিরক্ষর হওয়াটাই হলো মিথ্যা অপবাদ- কারীদের সব অহেতুক প্রলাপের অকাট্য, অপ্রতিরোধ্য ও অখন্ডনীয় উত্তর. যাতে একথা বলতে না পারে যে, তিনি স্বহস্তে লিখেছেন অথবা অন্যের কাছে শিখেছেন বা পূর্বের কোন সূত্র থেকে পাঠ করে সংগ্রহ করেছেন.

তাঁর কতিপয় মু'জেযা

তাঁর সব চাইতে বড় মু'জেজা কুরআন, যা কিয়ামত পর্যন্ত বিদ্যমান থাকবে এবং যা আরবি সাহিত্যের বড় বড় পন্ডিত ও সাহিত্যিকদের অপারগ করে দিয়েছে. আল্লাহ সবাইকে চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলেছেন যে, কুরআনের অনুরূপ ১০টি সূরা অথবা ১টি সূরা বা অন্ততঃপক্ষে ১টি আয়াত রচনা করে আনো.মুশরিকরা কুরআনের মু'জেযা স্বচক্ষে দেখেছে.

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মু'জেযার মধ্যে হলো, মুশরিকরা একবার তাঁকে একটি নিদর্শন দেখানোর কথা বললে তিনি চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়াকে দেখান. চন্দ্র বিদীর্ণ হয়ে দু'টুকরো হয়ে গিয়েছিল. অনেক বার তাঁর আঙ্গুলের ফাঁক দিয়ে পানি উৎসারিত হয়েছে. তাঁর হাতে পাথর তাসবীহ পাঠ করেছে. অতঃপর আবূ বাকার,উমার ও উসমানের হাতে সে পাথর তিনি রেখে দিলে তাঁদের হাতেও তাসবীহ পাঠ করেছে. আহার করাকালীন খাবার তাঁর কাছে

তাসবীহ পাঠ করতো এবং এর ধ্বনি সাহাবায়ে কেরাম শুনতে পেতেন. পাথর ও গাছ পালা তাঁকে সালাম করেছে. এক ইয়াহুদী নারী রাসূলকে বিষপানে হত্যা করার জন্য ছাগলের এক বিষ মাখা রানের গোশ্ত খেতে দিলে সে রান রাসূলের সাথে কথা বলে.একবার এক বেদুঈন তাঁকে একটি নিদর্শন দেখাতে বলে. তিনি একটি গাছকে নির্দেশ দিলে রাসূলের কাছে আসে. আবার নির্দেশ দিলে যথাস্থানে চলে যায়.এক দুগ্ধবিহীন ছাগলের স্তনে হাত মুবারাক স্পর্শ করায় দুগ্ধ আসে. তিনি তা দোহন করে নিজেও পান করেন এবং আবূ বাকারকেও পান করতে দেন. আলী ইবনে আবূ তালিবের ব্যথিত চোখে তিনি থুথু দিলে সঙ্গে সঙ্গে তা ভাল হয়ে যায়. এক সাহাবীর পা আহত হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ হাত বুলিয়ে দিলে সঙ্গে সঙ্গে ভাল হয়ে যায়. আনাস ইবনে মালিকের জন্য সুদীর্ঘায়ু, স্বচ্ছলতা এবং সন্তান-সন্ততি বেশী হওয়ার জন্য দুআ করেন. আল্লাহ তাঁর এসব জিনিসে এত বরকত দান করেন যে, তাঁর ১২০জন সন্তান জন্ম নেয়; তাঁর খেজুর গাছ বছরে দু'বার ফল দিতে লাগে ,অথচ এ কথা সুবিদিত যে খেজুর গাছে বছরে এক বারই ফল আসে. আর তিনি ১২০ বছর বয়স পেয়ে ছিলেন. সাহাবায়ে কেরামদের একজন রাসূলু- ল্লাহ ﷺ কে অনাবৃষ্টি ও খরার অভিযোগ করেন তিনি মিম্বার থেকেই দুআর জন্য হাত উঠালেন. আকাশে কোন মেঘ ছিল না. হঠাৎ পর্বত সম মেঘ ছেয়ে গেল এবং দ্বিতীয় পরবর্তী জুমআ পর্যন্ত মুষল ধারায় বৃষ্টি হলো. ফলে আবার অতিবৃষ্টির অভিযোগ করা হয়. রাসূলুল্লাহ ﷺ দুআ করলে বৃষ্টি বন্ধ হয়ে যায়. মানুষ রৌদ্রের মাঝে বের হয়ে গেলো.

একটি ছাগল ও এক 'সাআ' (আড়াই কিলো গ্রাম) যব দিয়ে এক হাজার পরিখা যুদ্ধের মুজাহিদগণকে খাওয়ান. সকলে পরিতৃপ্তি সহকারে খেয়ে চলে যান, কিন্তু খাবার সামান্যও কম হয়নি. অনুরূপভাবে অল্প খেজুর দিয়ে পরিখা যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের খাওয়ান, যে খেজুর বাশির ইবনে সা'দের কন্যা তার পিতা ও মামার জন্য এনে ছিলো এবং আবূ হুরাইরার স্বল্প খাদ্য দ্বারা পরিখা যুদ্ধের মুজাহিদগণকে পেট ভরে খাওয়ান. তাঁকে (রাসূলকে) হত্যা করার জন্য অপেক্ষারত এক শ'জন কুরাইশী ব্যক্তির মুখের উপর মাটি ছিটিয়ে দিলে কেউ তাঁকে দেখতে সক্ষম হয়নি. তিনি তাদের নাকের ডগাদিয়ে চলে গেলেন. সুরাক্বা ইবনে মালেক তাঁকে হত্যা করার জন্যে পিছু ধাওয়া করে. যখন সে তাঁর নিকটবর্তী হয় তিনি তার জন্য বদ্দুআ করলে তার ঘোড়ার পা মাটিতে ঢুকে যায়.

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবনী থেকে সংগৃহীত উপদেশাবলী

তাঁর রসিকতাঃ তিনি তাঁর সাহাবীদের সাথে হাসি-ঠাট্টা করতেন. তাঁর পরিবারের সাথে রসিতাপূর্ণ বাক্য বিনিময় করতেন. ছোটদের গুরুত্ব দিয়ে তাঁর সময়ের কিছু সময় তাদের জন্যও নির্দিষ্ট করতেন. তাদের সাথে তাদের বোধ ও সামর্থ্য অনুযায়ী আচরণ করতেন. কখনো তিনি তাঁর খাদেম আনাস ইবনে মালিক ﷺ এর সাথে রহস্য ক'রে বলতেন, 'ইয়া যাল উযুনায়ইন' "হে দুই কানের অধিকারী" (তিরমিযী ১৯৯২, হাদীসটি সহীহ. দ্রষ্টব্যঃ সুনানে তিরমিযী আলবানীঃ ১৯৯২) এক ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে একটি সওয়ারী দিন. তিনি তাকে ঠাট্টাচ্ছলে

বললেন, "আমরা তোমাকে একটি উষ্ট্রীর বাছুর দেবো." সে বললো, উষ্ট্রীর বাছুর দিয়ে আমি কি করবো? তখন নবী করীম ﷺ বললেন, "উটকে উষ্ট্রী ছাড়া আবার কে প্রসব করে?" (আবূ দাউদ ৪৯৯৮, হাদীসটি সহীহ. দ্রষ্টব্যঃ সুনানে আবূ দাউদ আলবানীঃ ৪৯৯৮) স্বীয় সাথীদের সাথে সব সময় মুচকি হাসি ও প্রফুল্লতা প্রদর্শন করতেন. তাঁর নিকট থেকে তাঁরা উত্তম বাক্য ব্যতীত কিছুই শুনতেন না. জারির ﷺ থেকে বর্ণিত. তিনি বলেন, 'যখন থেকে আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি, তখন থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বাধা দান করেন নি (অর্থাৎ, যে কোন সময় তাঁর কাছে প্রবেশ করতে বাধা দান করেন নি) এবং আমাকে দেখলেই মুচকি হাসি দিয়েছেন. (একদা) আমি তাঁর কাছে অভিযোগ করলাম যে, আমি ঘোড়ার পিঠে স্থির বসে থাকতে পারি না, তখন তিনি আমার বুকে চাপড় দিয়ে দুআ করলেন,

((اللَّهُمَّ ثَبِّتْهُ وَاجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا))

অর্থাৎ, "হে আল্লাহ! তাকে স্থির রাখো এবং সৎপথ প্রদর্শনকারী ও সৎপথ প্রাপ্ত করে দাও." (বুখারী ৩০৩৬-মুসলিম ২৪৭৫) তিনি তাঁর আত্মীয়দের সাথেও রসিকতা করতেন. একদা তিনি তাঁর মেয়ে ফাতিমার বাড়িতে এলেন, কিন্তু বাড়িতে তাঁর স্বামী আলীকে দেখলেন না. তাই জিজ্ঞেস করলেন, "সে কোথায়?" ফাতিমা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বললেন, তাঁর ও আমার মধ্যে (সামান্য) মনোমালিন্য হলে তিনি আমার উপর রাগ ক'রে বের হয়ে গেছেন. তিনি ﷺ তাঁর কাছে এলেন. তিনি মসজিদে শুয়ে ছিলেন. তাঁর

চাদরটা (গা) থেকে পড়ে গেছিলো. তাই গায়ে ধুলা লেগেছিলো. তিনি ﷺ তাঁর শরীর থেকে ধুলা মুছতে মুছতে বললেন,

((قُمْ يَا أَبَا التُّرَاب، قُمْ يَا أَبَا التُّرَاب))

অর্থাৎ, "হে মাটির বাপ উঠো! হে মাটির বাপ উঠো! (বুখারী ৩৭০ ৩)

ছোটদের সাথে তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) আচরণ

তাঁর মহান চরিত্রের এক বিরাট অংশ তাঁর পরিবারের লোক, স্ত্রীগণ এবং তাঁর মেয়েরাও পেয়েছেন. তিনি তাঁর স্ত্রী আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)র সাথে দৌড় প্রতিযোগিতা করতেন. তাঁকে তাঁর সখীদের সাথে খেলতে দিতেন. আয়েশা (রাযী আল্লাহু আনহা) বলেন, 'আমি নবী করীম ﷺ-এর নিকটেই পুতুল নিয়ে খেলা করতাম. আমার অনেকগুলো সখী ছিলো তারা আমার সাথে খেলা করতো. রাসূলু ﷺ বাড়িতে প্রবেশ করলে তারা লুকিয়ে যেতো. তিনি তাদের আবার আমার সাথে খেলতে পাঠাতেন.' (বুখারী ৬১৩০) অনুরূপ তিনি ছোটদের গুরুত্ব দিতেন, তাদের সাথে হাসি-ঠাট্টা করতেন এবং তাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করতেন. যেমন, আব্দুল্লাহ ইবনে শাদ্দাদ তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, 'বিকালের কোন এক নামাযে (যোহর অথবা আসরে) রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নিকট উপস্থিত হলেন. তিনি হাসান অথবা হুসায়েনকে কোলে ক'রে নিয়ে এসেছিলেন. সামনে অগ্রসর হয়ে তাঁকে নামিয়ে দিলেন. অতঃপর তকবীর দিয়ে নামায আরম্ভ করলেন. সাজদা

করলে তা সুদীর্ঘ করলেন. আমার পিতা বলেন, আমি মাথা উঠিয়ে দেখলাম যে, রাসূলের সাজদারত অবস্থায় শিশুটি তাঁর পিঠের উপর চড়ে বসেছে. আমি পুনরায় সাজদায় ফিরে গেলাম. রাসূলুল্লাহ ﷺ নামায শেষ করলে, লোকে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি সুদীর্ঘ সাজদা করেছেন এমনকি আমরা মনে করেছিলাম, কোন কিছু ঘটেছে অথবা আপনার প্রতি অহী অবতীর্ণ হচ্ছে. তিনি ﷺবললেন,

((كُلُّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ وَلَكِنَّ ابْنِي ارْتَحَلَنِي فَكَرِهْتُ أَنْ أُعَجِّلَهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ))

অর্থাৎ, "এ সবের কোন কিছুই ঘটেনি, তবে আমার এই ছেলেটা আমার উপরে চড়ে বসেছিলো তাই তাকে ত্বরান্বিত করতে ভাল মনে করলাম না, যাতে সে তার সাধ-ইচ্ছা পূরণ করে নেয়." (নাসায়ী ১১২৯, আহমদ ১৫৬০৩, হাদীসটি সহীহ. দ্রষ্টব্যঃ সুনানে নাসায়ী আলবানীঃ ১১৪১) আনাস ইবনে মালিক ﷺ থেকে বর্ণিত. তিনি বলেন, 'নবী করীম ﷺ মানুষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উন্নত চরিত্রের অধিকারী ছিলেন. তিনি আমার এক ছোট ভাইকে (রসিকতা ক'রে) "ইয়া আবা উমায়ের মা-ফা'আলান্নু- গায়ের?" (হে উমায়েরের বাপ! তোমার নুগায়েরের খবর কি?) 'নুগায়ের' ছোট একটি পাখী ছেলেটি তা নিয়ে খেলা করতো (পাখিটি মারা গেলে তিনি তাকে এ কথা বলেছিলেন). এই রূপ আচরণে ছেলেটির প্রতি রয়েছে সান্ত্বনা দানের সুর.

স্বীয় পরিবারবর্গের সাথে তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) আচরণ

স্বীয় পরিবারবর্গের সাথে নবী করীম ﷺ-এর আচরণের ব্যাপারেও দেখা যায় যে, চারিত্রিক সকল উৎকর্ষ এক্ষেত্রেও সন্নিবেশিত হয়েছে. তিনি সর্বাধিক নম্র ও বিনয়ী ছিলেন. তিনি সব সময় তাঁর পরিবারের প্রয়োজনাদির খেয়াল রাখতেন. মহিলাদেরকে মানুষ, জননী, স্ত্রী এবং কন্যা ও জীবন সঙ্গিনী হিসেবে গণ্য ক'রে তাদের স্ব স্ব মর্যাদা দান করতেন. এক ব্যক্তি এসে জিজ্ঞেস করলো, মানুষের মধ্যে আমার উত্তম ব্যবহার পাওয়ার সর্বাধিক অধিকারী কে? তিনি বললেন, "তোমার মা. তোমার মা. তোমার মা. তারপর তোমার বাপ." (বুখারী ৫৯৭১-মুসলিম ২৫৪৮) তিনি ﷺ আরো বলেন, "যে ব্যক্তি তার পিতা-মাতা উভয়কে অথবা তাদের কোন একজনকে পেলো, কিন্তু তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করলো না, ফলে মারা গিয়ে জাহা- ন্নামে প্রবেশ করলো, তাকে আল্লাহ (তাঁর রহমত থেকে আরো)দূর করুন!" (আমহদ ১৮৫৪৮)

তিনি ﷺ স্বীয় স্ত্রীর পান করা পাত্র নিয়ে নিজের মুখ সেখানেই লাগিয়ে পান করতেন, যেখানে তাঁর স্ত্রী মুখ লাগিয়ে পান করেছিলেন. আর তিনি ﷺ বলতেন, "তোমাদের মধ্যে সেই সব চেয়ে উত্তম, যে তার পরিবারের জন্য উত্তম এবং আমি আমার পরিবারের জন্য উত্তম." (আবূ দাউদ ৪৮৯৯, তিরমিযী ৩৮৯৫, হাদীসটি সহীহ. দ্রষ্টব্যঃ সুনানে আবূ দাউদ ও তিরমিযী আলবানীঃ ৪৮৯৯-৩৮৯৫)

তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) দয়া-দাক্ষিণ্য

তাঁর দয়ার বর্ণনা হলো এই যে, তিনি বলেন,

((الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمْ الرَّحْمَنُ ارْحَمُوا مَنْ فِي الْأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ))

অর্থাৎ, "দয়া প্রদর্শনকারীদের প্রতি দয়াবান আল্লাহ দয়া করবেন. তোমরা যমীনবাসীর প্রতি দয়া করো, তাহলে যিনি আসমানে আছেন, তিনি তোমাদের প্রতি দয়া করবেন." (আবূ দাউদ ৪৯৪১ তিরমিযী ১৯২৪, আহমদ ৬৪৫৮, হাদীসটি সহীহ. দ্রষ্টব্যঃ সুনানে আবূ দাউদ ও তিরমিযী আলবানীঃ ৪৯৪১- ১৯২৪) আমাদের মহান নবী ﷺ এই মহান চরিত্রের বহু অংশের অধিকারী ছিলেন. তাঁর এই চরিত্র পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠে ছোট-বড়, আত্মীয়, অনাত্মীয় সকলের সাথে তাঁর আচার-আচরণের মাধ্যমে. আর এটাও তাঁর দয়া-দাক্ষিণ্যের আওতাভুক্ত যে, তিনি শিশুর কান্নার শব্দ শুনে নামাযকে লম্বা না করে হাল্কা করতেন. যেমন, আবূ ক্বাতাদা ﷺ নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন. তিনি ﷺ বলেছেন,

((إِنِّي لَأَقُومُ فِي الصَّلَاةِ أُرِيدُ أَنْ أُطَوِّلَ فِيهَا فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَأَتَجَوَّزُ فِي صَلَاتِي كَرَاهِيَةَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمِّهِ))

অর্থাৎ, "আমি নামাযে দাঁড়িয়ে ইচ্ছা করি তা লম্বা করার কিন্তু শিশুর কান্নার শব্দ শুনে আমি আমার নামাযকে সংক্ষিপ্ত করি, কারণ আমি শিশুর মাকে কষ্ট দিতে চাইনা." (বুখারী ৭০৭- মুসলিম৪৭০) উম্মতের প্রতি তাঁর দয়া এবং তাদের আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ হওয়ার ব্যাপারে তিনি এতই আগ্রহী ছিলেন যে, এক

ইয়াহুদী বালক-সে নবীর খেদমত করতো-অসুস্থ হলে তিনি তাকে দেখার জন্য এসে তার মাথার কাছে বসে তাকে বললেন, "ইসলাম গ্রহণ করো." ছেলেটি তার মাথার কাছে দন্ডায়মান স্বীয় পিতার দিকে তাকালে তার পিতা তাকে বললো, আবূল ক্বাসিম (রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপনাম)-এর আনুগত্য করো. ফলে ছেলেটি ইসলাম গ্রহণ করলো. তারপর একটু পরেই সে মারা গেলো. রাসূলুল্লাহ ﷺ এই বলতে বলতে তার কাছ থেকে বের হয়ে গেলেন, "সেই আল্লাহরই প্রশংসা যিনি একে জাহান্নাম থেকে বাঁচিয়ে নিলেন." (বুখারী ১৩৫৬)

তাঁর ﷺ সহিষ্ণুতা

তাঁর সহিষ্ণুতা সম্পর্কে আলোচনা প্রকৃতপক্ষে তাঁর সম্পূর্ণ জীবন এবং তাঁর জীবনীর সমূহ ঘটনাবলীর বিস্তারিত অলোচনা করা. কারণ, তাঁর পুরো জীবনটাই হলো সহিষ্ণুতা-ধৈর্যশীলতা, জিহাদ ও শ্রম-সাধনায় পরিপূর্ণ. যেদিন প্রথম আয়াতটি নাযিল হয়, সেদিন থেকে নিয়ে তাঁর জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি অব্যাহতভাবে সহিষ্ণুতা অবলম্বন ক'রে বিরতিহীন আমল জারী রেখেছিলেন. যেদিন তিনি নবীরূপে নির্বাচিত হোন, প্রথম যেদিন তাঁর সাথে ফেরেশতার সাক্ষাৎ হয়, যেদিন খাদীজা তাঁকে ওরাক্বা ইবনে নাওফালের কাছে নিয়ে যান, ওরাক্বা ইবনে নাওফাল তাঁকে যখন বললেন, আমি যদি সে সময় জীবিত থাকতাম, যখন তোমার জাতি তোমাকে মক্কা থেকে বের করে দেবে, তিনি ﷺ তখন ওরাক্বা ইবনে নাওফালকে জিজ্ঞেস করলেন, "তারা কি সত্যিই আমাকে

বের করে দেবে?" অরক্বা বললেন, হ্যাঁ, যা নিয়ে তুমি এসেছো, তদ্রূপ কোন কিছু নিয়ে যে ব্যক্তিই এসেছে, তার সাথে শত্রুতা করা হয়েছে, সেই দিন থেকে তিনি নিশ্চিতভাবে অবগত ছিলেন যে, এই পথে তাঁকে কোন্ কোন্ জিনিসের সম্মুখীন হতে হবে. ফলে তিনি শুরু থেকেই কষ্ট, কাঠিন্য এবং প্রতারণা ও শত্রুতা সহ্য করার জন্য নিজেকে প্রস্তুত রেখেছিলেন.

তাঁর ধৈর্যের কঠিন মুহূর্তগুলোর মধ্যে এটাও বড় কঠিন মুহূর্ত ছিল, যখন অবিরাম মাত্রার শুরু হয়েছিল তাঁর সাথে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করার পালা. তাঁর জাতির পক্ষ হতে তাঁর উপর ও তাঁর পরিবারের উপর চালানো হচ্ছিল দৈহিক নির্যাতন. প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছিল তাঁর প্রতিপালকের পয়গমকে রোধ করার.

অনুরূপ তাঁর ধৈর্যের বাস্তব চিত্র তখনও পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠেছিলো, যখন তিনি মক্কায় তাঁর প্রতিপালকের পায়গাম পৌঁছাতে গিয়ে স্বীয় জাতি, পরিবারবর্গ এবং নিজের বংশের লোকদের নিকট থেকে দৈহিক পীড়া প্রাপ্ত হয়েছিলেন. যেমন, বুখারী শরীফে বর্ণিত যে, উরওয়া ইবনে যুবায়ের আম্র ইবনে আ'সকে অতীব কঠিন সে আচরণটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন, যা মুশরিকরা নবী করীম ﷺ-এর সাথে করেছিলো. তিনি বললেন, 'একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ কা'বার পাশে নামায পড়ছিলেন, এমতাবস্থায় উক্ববা ইবনে আবূ মুআইত্ব তাঁর দিকে অগ্রসর হয়ে নিজের চাদর তাঁর গলায় জড়িয়ে খুব জোরে টান দেয়. তখন আবূ বাকার ﷺ তার (উক্ববার) কাঁধদু'টি ধরে তাকে নবী করীম ﷺ থেকে ঠেলে সরিয়ে দেন এবং বললেন, তোমরা এমন ব্যক্তিকে হত্যা করতে চাও, যিনি বলেন, আমার প্রতিপালক

আল্লাহ?" (বুখারী ৩৬৭৮) অনুরূপ কোন একদিন তিনি ﷺ কা'বার নিকট নামায পড়ছিলেন এবং আবূ জেহেল ও তার কয়েকজন সঙ্গী সেখানে বসেছিলো. এমন সময় তারা পরস্পর বলাবলি করতে লাগলো, তোমাদের মধ্য থেকে কে পারে উমুক গোত্রের উটের বাচ্চাদানি এনে মুহাম্মাদ যখন সাজদায় যাবে তার পিঠের উপর রেখে দিতে? অতঃপর তাদের মধ্যে সর্বাধিক হতভাগ্য ব্যক্তিটি উঠে গিয়ে তা এনে অপেক্ষায় রইলো. রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন সাজদায় গেলেন, তখন সেই পাষন্ডটি সেটি তাঁর দু'কাঁধের মধ্যখানে পিঠের উপর রেখে দিলো. তারা হাসাহাসি করতে এবং (হেসে) একে অপরের উপর গড়িয়ে পড়তে লাগলো. রাসূলুল্লাহ ﷺ সাজদায় ছিলেন, তিনি মাথা তুলতে পারছিলেন না. এমন সময় তাঁর মেয়ে ফাতিমা এসে তা তাঁর পিঠ থেকে সরালেন.' (বুখারী ২৪০)

এর থেকেও কঠিন হলো তাঁর মানসিক কষ্ট, যা তিনি পেতেন তাঁর দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করলে, তাঁকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করলে এবং এই অপবাদ দিলে যে, তিনি জ্যোতিষী, কবি, পাগল, যাদুকর এবং যেসব নিদর্শনাবলী তিনি নিয়ে এসেছেন, তা সবই হলো, পূর্ববর্তীদের কিচ্ছা- কাহিনী. এরই পর্যায়ভুক্ত হলো আবূ জেহেলের বিদ্রূপমূলক এই উক্তি, 'হে আল্লাহ! যদি এই (মুহাম্মাদ) তোমার পক্ষ থেকে সত্যবাদী হয়, তাহলে আমাদের উপরে পাথরের বৃষ্টি বর্ষণ করো অথবা আমাদের উপরে কঠিন আযাব নাযিল করো. তাঁর চাচা আবূ লাহাব তো সব সময় তাঁর পিছনে লেগে থাকতো যখন তিনি লোকদের দাওয়াত দেওয়ার জন্য তাদের সমাবেশে এবং বাজারে যেতেন. সে (আবূ লাহাব) তাঁকে মিথ্যাপ্রতিপন্ন করতো

এবং লোকদের নিষেধ করতো তাঁর সত্যায়ন করতে. এদিকে তার স্ত্রী উম্মে জামীল কাঁটা বিশিষ্ট ডাল কেটে এনে তাঁর পথে ফেলে রাখতো.

নির্যাতন-নিপীড়ন তার শেষ সীমায় গিয়ে পৌঁছে যখন তাঁকে তাঁর সাথীদের সহ তিন বছর পর্যন্ত আবূ তালিবের উপত্যাকায় অবরুদ্ধ জীবন যাপন করতে হয়. এমন কি ক্ষুধার জ্বালায় গাছের পাতাও খেতে হয়. দুঃখ তখন আরো বৃদ্ধি পায়, যখন তিনি তাঁর স্ত্রীকে হারান. যিনি তাঁকে সান্ত্বনা দিতেন ও তাঁর সাহায্য করতেন. অতঃপর তাঁর চাচাও হঠাৎ করে মারা যান যিনি তাঁর হেফাযত করতেন এবং তাঁর হয়ে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ করতেন. আবার তার (চাচার) কুফ্‌রী অবস্থায় মারা যাওয়ায় দুঃখের মাত্রা আরো বেড়ে যায়. শেষ পর্যায়ে একদিন তাঁকে হত্যা করার কয়েকবার প্রচেষ্টা চালানোর পর তাঁর মাতৃভূমি থেকে তিনি হিজরত করে চলে যান. মদীনায় ধৈর্য ও ত্যাগের নতুন জীবন শুরু হয়. সে জীবন শুধু কষ্ট ও পরিশ্রমের, ক্ষুধা ও অভাবের. ক্ষুধার জ্বালায় পেটে পাথর বেঁধে রাখার জীবন. তিনি ﷺ বলেন,

((لَقَدْ أُخِفْتُ فِي اللهِ وَمَا يُخَافُ أَحَدٌ وَلَقَدْ أُوذِيتُ فِي اللهِ وَمَا يُؤْذَى أَحَدٌ وَلَقَدْ أَتَتْ عَلَيَّ ثَلَاثُونَ مِنْ بَيْنِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ وَمَا لِي وَلِبِلَالٍ طَعَامٌ يَأْكُلُهُ ذُو كَبِدٍ إِلَّا شَيْءٌ يُوَارِيهِ إِبْطُ بِلَالٍ))

অর্থাৎ, "আল্লাহর দ্বীনের প্রচারের কাজে আমাকে যেভাবে ভীত-সন্ত্রস্ত করা হয়েছে, অন্য কাউকে সেভাবে করা হয় নি.আমাকে

যেভাবে কষ্ট দেওয়া হয়েছে, অন্য কাউকে সেভাবে দেওয়া হয় নি. ত্রিশ দিন ও রাত আমার উপর এমনও অতিবাহি হয়ে গেছে যে, আমার ও বিলালের কাছে কোন প্রাণীর খাবার মত কিছুই ছিলো না, কেবল সেই স্বল্প পরিমাণটুকু ছাড়া, যা বিলাল তাঁর বগলের তলে লুকিয়ে এনেছিলেন." (তিরমিযী ২৪৭২ ইবনে মাজা ১৫১, আহমদ ১১৮০২, হাদীসটি সহীহ. দ্রষ্টব্যঃ সুনানে তিরমিযী ও ইবনে মাজা আলবানী ২৪৭২- ১৫১)

তাঁর সম্ভ্রমে অপবাদ দেওয়া হয়. মুনাফেক্ব ও মূর্খ বেদুঈন লোকদের পক্ষ থেকেও তাঁকে কষ্ট পেতে হয়. বরং বুখারী শরীফে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ ﵁ বর্ণিত. তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ (যুদ্ধলব্ধ মাল) বন্টন করলেন. আনসারদের হতে একজন বললো, আল্লাহর শপথ! মুহাম্মাদের এতে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের ইচ্ছা নেই. ইবনে মাসউদ ﵁ বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকটে এসে এ খবর তাঁকে জানালাম. (শুনে) তাঁর চেহারা পরিবর্তন হয়ে যায় এবং তিনি বলেন,

((رَحِمَ اللهُ مُوسَى قَدْ أُوذِيَ بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا فَصَبَرَ))

অর্থাৎ, "আল্লাহ মুসার প্রতি রহম করুন! তাঁকে এর চেয়েও বেশী কষ্ট দেওয়া হয়েছিলো, তবুও তিনি ধৈর্য ধরেছিলেন." (বুখারী ৪৩৩৬) আর তাঁর ধৈর্য ধরার মুহূর্তগুলোর মধ্যে হলো সেই দিনগুলো, যেদিনে তাঁর ছেলে-মেয়েরা মৃত্যুবরণ করেন. তাঁর সন্তান ছিলো সাতজন. একের পর এক তাঁরা সব মারা যান. ফাতিমা ব্যতীত

তাঁদের মধ্যে কেউ অবশিষ্ট ছিলেন না. তবুও তিনি দমেও যান নি ভেঙ্গেও পড়েন নি, বরং সুন্দর ধৈর্য প্রদর্শন করেছেন. এমন কি ছেলে ইবরাহীমের মৃত্যুর দিনে তাঁর মুখ থেকে এই উক্তি বর্ণিত হয়েছে যে,

((إِنَّ الْعَيْنَ تَدْمَعُ، وَالْقَلْبَ يَحْزَنُ، وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا، وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ))

অর্থাৎ, "চক্ষু অশ্রু ঝরায়, অন্তর ব্যথিত হয় এবং আমরা তা-ই বলবো, যাতে আমাদের প্রতিপালক সন্তুষ্ট হোন. আর হে ইবরাহীম! আমরা তোমার বিচ্ছেদে মর্মাহত." (বুখারী ১৩০৩)

আর নবী করীম ﷺ-এর সহিষ্ণুতা ও ধৈর্য কেবল নির্যাতন-নিপীড়ন এবং বিপদাপদের মধ্যেই সীমিত ছিলো না, বরং পূত-পবিত্র মহান আল্লাহর আনুগত্যের ক্ষেত্রেও তিনি বড়ই ধৈর্য প্রদর্শন করেছেন. তাঁর প্রতিপালক তাঁকে এর নির্দেশও দিয়েছেন. তাই তিনি আল্লাহর ইবাদত ও আনুগত্যে এমনভাবে পরিশ্রম করতেন যে, দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার কারণে তাঁর পা দু'টি ফুলে যেতো. রোযা ও যিক্‌র সহ অন্যান্য ইবাদতসমূহ খুব বেশী বেশী করতেন. (এত বেশী কেন করেন) এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলে, বলতেন, "আমি কি আল্লাহর কৃতজ্ঞ বান্দা হবো না?"

তাঁর ইবাদত

নবী করীম ﷺ স্বীয় প্রতিপালকের সীমাহীন ইবাদত করতেন. সব সময় যিক্‌র এবং চিন্তা ও গবেষণায় লেগে থাকতেন. এমন কি যখন

তিনি কোন দুশ্চিন্তা ও দুঃখের শিকার হতেন, তখন বিলাল ﷺকে বলতেন, "নামাযের মাধ্যমে আমাকে স্বস্তি দাও হে বিলাল." তিনি রাতে তাহাজ্জুদের নামায পড়তে গিয়ে এত সুদীর্ঘ কিয়াম করতেন যে তাঁর সুদীর্ঘ এই কিয়ামের (দাঁড়িয়ে থাকার) কারণে তাঁর পা দুটো ফুলে যেতো. তিনি কুরআনের তেলাওয়াত করতেন. আয়াতগুলো বার বার পড়তেন এবং এমনভাবে কাঁদতেন যে, অত্যধিক কাঁদার কারণে তাঁর দাড়ি ভিজে যেতো. তাঁর স্ত্রী আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তাঁকে বলতেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি এত কষ্ট কেন করেন আল্লাহ তো আপনার পূর্বাপর সমস্ত গুনাহ মাফ করে দিয়েছেন? তখন তিনি ﷺ বলতেন, "আমি কি আল্লাহর কৃতজ্ঞ বান্দা হবো না?" রাতের বেশীভাগ অংশ স্বীয় প্রতিপালকের সাথে মুনাজতে লিপ্ত থাকতেন. তাঁর কিবাত পাঠ করতেন এবং একাগ্রচিত্তে তাঁর স্মরণে মগ্ন থাকতেন.

তিনি ﷺ খুব বেশী রোযাও রাখতেন. সফরে থাকলেও রাখতেন এবং বাড়ীতেও. গরমের দিনেও রাখতেন এবং ঠান্ডার দিনেও. আবূদ্দারদা ﷺ বলেন, অত্যধিক গরমের দিন, সেই আল্লাহর শপথ! যিনি ছাড়া সত্য কোন উপাস্য নেই, সূর্যের তাপের প্রচন্ড তীব্রতার কারণে আমাদের কেউ কেউ তার হাতকে মাথার উপর রাখত এবং তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ ও ইবনে রাওয়াহা ব্যতীত আমরা কেউ রোযা রাখতাম না.

সাদক্বার ব্যাপারে নবী করীম ﷺ সীমাহীন দানশীল ছিলেন. তিনি তাঁর কাছে যা কিছু থাকতো সব কিছুকেই সাদক্বা করে দিতেন. তিনি

কোন অভাবের ভয় না ক'রে দিয়েই যেতেন. কোন ভিক্ষুখকে কোন দিন ফিরিয়ে দিতেন না. কেউ তাঁর কাছে কোন কিছু চাইলে তাকে শূন্য হাতে ফিরাতেন না. বরং তাঁর সাহায্য-সহযোগিতা করতেন. যেমন, তাঁর ব্যাপারে তাঁর সাহাবীগণ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে কোন কিছু চাইলে তিনি কখনোও না করেননি."

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)-এর বিষয়-বিতৃষ্ণা

কোন কিছু থেকে অনাসক্তি বশতঃ মুখ ফিরিয়ে নেওয়াকে 'যুহ্দ' বলে. এই গুণে ভূষিত কেবল তাকেই করা যায়, যার জন্য কোন জিনিস লাভ করা সহজ হয়ে যায়, কিন্তু তার প্রতি অনাসক্তি প্রদর্শন ক'রে সে তা ত্যাগ করে. আমাদের নবী ﷺ মানুষের মধ্যে সব চেয়ে বেশী দুনিয়ার প্রতি অনানুরক্ত ছিলেন এবং তার প্রতি তাঁর আকর্ষণ সর্বাপেক্ষা কম ছিলো. যা পেতেন, তা-ই যথেষ্ট মনে করতেন. তিনি তাঁর এই কঠিন জীবন নিয়ে সন্তুষ্ট ছিলেন. অথচ দুনিয়া ছিলো তাঁর সামনেই. তিনি হলেন আল্লাহর সৃষ্টির সর্বাধিক সম্মানিত ব্যক্তি. তিনি চাইলে মহান আল্লাহ তাঁকে তাঁর ইচ্ছামত অঢেল ধন-সম্পদ দান করতেন.

ইবনে কাসীর (রাহঃ) তাঁর তফসীর গ্রন্থে খাইষামা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম ﷺকে বলা হলো, যদি তুমি চাও তো যমীনের ধন-ভান্ডার ও তার চাবী তোমাকে দান করবো, যা তোমার পূর্বে কোন নবীকে দান করে নি এবং তোমার পরেও কাউকে দান করবো না. আর এতে আল্লাহর নিকট তোমার জন্য যা সুরক্ষিত আছে, তা থেকেও কিছু কমবে না. তিনি ﷺ বললেন, "বরং তা

আমাকে আখেরাতে দেওয়ার জন্য জমা রাখুন!" তাঁর জীবন ও জীবিকা ছিলো বিস্ময়কর. আবূ যার ﷺ বলেন, আমি নবী করীম ﷺ-এর সাথে মদীনার উত্তপ্ত প্রস্তরময় যমীনে হেঁটে যাচ্ছিলাম. আমাদের সামনে এলো ওহুদ পাহাড়. তখন তিনি ﷺ বলেন,

((مَا يَسُرُّنِي أَنَّ عِنْدِي مِثْلَ أُحُدٍ هَذَا ذَهَبًا تَمْضِي عَلَيَّ ثَالِثَةٌ وَعِنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ إِلَّا شَيْئًا أَرْصُدُهُ لِدَيْنٍ إِلَّا أَنْ أَقُولَ بِهِ فِي عِبَادِ اللهِ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ وَمِنْ خَلْفِهِ))

অর্থাৎ, "ওহুদ পাহাড় সমান সোনা আমার কাছে থাকলে আমি চাইবো না যে তিনদিন অবধি তার এক দীনারও আমার কাছে থাকুক, কেবল ততটুকু পরিমাণ ছাড়া যা আমি ঋণ পরিশোধ করার জন্য রাখবো. আমি সমূহ সোনাকে আল্লাহর বান্দাদের মাঝে ডান দিকে বাম দিকে ও পিছন দিকে এইভাবে এইভাবে বন্টন করে দেবো." (বুখারী ৬৪৪৪-মুসলিম ৯৯১) তিনি আরো বলতেন,

((مَا لِي وَمَا لِلدُّنْيَا مَا أَنَا فِي الدُّنْيَا إِلَّا كَرَاكِبٍ اسْتَظَلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا))

অর্থাৎ, "দুনিয়ার প্রতি আমার কোন আকর্ষণ নেই এবং দুনিয়ারও আমার প্রতি কোন ভালবাসা নেই. আমি দুনিয়ায় সেই আরোহীর মত, যে কোন গাছের ছায়ায় একটু বিশ্রাম ক'রে আবারও সে ছায়া ছেড়ে চলে যায়." (তিরমিযী ২৩৭৭-ইবনে মাজা ৪১০৯, হাদীসটি সহীহ. দ্রষ্টব্যঃ সুনানে তিরমিযী ও ইবনে মাজা আলবানীঃ ২৩৭৭-৪১০৯)

তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) আহার ও পরিধান

তাঁর আহারের ব্যাপারটা হলো এই যে, কখনো এক মাস, দু'মাস ও তিনমাস তাঁর উপর দিয়ে এমন অবস্থায় অতিবাহিত হয়ে যেতো যে, তাঁর বাড়িতে (উনুনে) আগুন জ্বলতো না. কেবল দুই কালো বস্তু অর্থাৎ, খেজুর ও পানিই হতো তাঁর খাবার. কখনো ক্ষুধার কারণে পুরো দিন পেটের ব্যথায় ভুগতেন এবং পেটে ভরার মত কিছু পেতেন না. তাঁর (খাবার) রুটি বেশীর ভাগই হতো যবের. তাঁর ব্যাপারে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি কখনো নরম-মোলায়েম রুটি খান নি. (বুখারী ৫৩৮৫) বরং তাঁর খাদেম আনাস ﷺ এও উল্লেখ করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে কখনোও রুটি ও গোশ্ত সহ দুপুরের ও রাতের খাবার একত্রে বিদ্যমান থাকে নি, কেবল সেদিন ব্যতীত, যেদিন তার কাছে কোন অতিথি আসতো. (আহমদ ১৩৪৪৭)

পরিধানের ব্যাপারেও তাঁর অবস্থা উল্লিখিত অবস্থার থেকে কম ছিলো না. পরিধানের ব্যাপারেও তাঁর সাহাবা (রাযীআল্লাহু আনহুম) গণ তাঁর বিষয়-অনাসক্তি ও অনাড়ম্বরতার সাক্ষ্য দিয়েছেন. অথচ অতীব মূল্যবান পোশাক পরার সামর্থ্য তাঁর ছিলো. একজন সাহাবী তাঁর পোশাকের কথা বর্ণনা ক'রে বলেছেন যে, কোন এক ব্যাপারে কথা বলার জন্য আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এলাম, দেখলাম তিনি মোটা সুতির লুঙ্গি পরে বসে আছেন. আবূ বারদা ﷺ আয়েশা (রাযি- য়াল্লাহু আনহা)র কাছে প্রবেশ করলে, তিনি তাঁকে তালি দেওয়া একটি চাদর এবং মোটা একটি লুঙ্গি বের ক'রে দিয়ে বললেন, এই দু'টি পরিহিত অবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ মৃত্যুবরণ

করেন. (মুসলিম ২০৮০) আনাস ইবনে মালিক ﷺ থেকে বর্ণিত. তিনি বলেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে যাচ্ছিলাম তিনি পুরু পাড় বিশিষ্ট একটি নাজরানী চাদর (গায়ে) জড়িয়ে ছিলেন.' (বুখারী ৫৮০৯) মৃত্যুর সময় তিনি না রেখে গেছেন দীনার ও দিরহাম (টাকা-পয়সা), না কোন ক্রীতদাস-দাসী আর না অন্য কোন কিছু, কেবল তাঁর সাদা খচ্চর, অস্ত্র এবং কিছু যমীন যা তিনি সাদক্বা করে গেছেন. আয়েশা (রাযীআল্লাহু আনহা) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মৃত্যুর সময় আমার বাড়ির তাকে সামান্য যব ব্যতীত এমন কোন জিনিস ছিলো না, যা কোন প্রাণী খেতে পারে. (বুখারী ৩৯৭-মুসলিম ২৯৭৩) অনুরূপ মৃত্যুর সময় তাঁর বর্মটা একজন ইয়াহুদীর নিকট কিছু যবের বিনিময়ে বন্ধক ছিলো. (বুখারী ২৯১৬)

তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) সুবিচার

তাঁর সুবিচার হলো, তিনি তাঁর গৌরবময় মহান প্রতিপালকের কার্যকলাপে সুবিচার করেছেন. স্বীয় নাফ্সের সাথে আচরণে সুবিচার করেছেন. তাঁর স্ত্রীগণের এবং অন্যান্য সকল নিকটের ও দূরের, সাথী বা বন্ধুর, যে তাঁর পক্ষের এবং যে বিপক্ষের এমন কি যে তাঁর বড় শত্রু তার সাথেও তিনি সুবিচার করেছেন. কোন জাতি তাঁর উপর অভিযোগ করেছে, কেউ তাঁর ব্যাপারে ভুল করেছে, কিন্তু তিনি কোন সময় সুবিচার ত্যাগ করেন নি. সুবিচার ছিলো রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবনের সর্বাবস্থার অবিচ্ছেদ্য অংশ. তিনি সাহাবাগণ থেকে নিজের স্বতন্ত্রতা পছন্দ করতেন না, বরং তিনি ন্যায় ও সমতা ভাল বাসতেন. তাঁদের মত তিনিও কষ্ট-ক্লেশ ও ক্লান্তি সহ্য করতেন.

যেমন, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ ﷺ থেকে বর্ণিত. তিনি বলেন, 'বদরের দিন আমাদের প্রত্যেক তিনজনের জন্য ছিলো একটি উট. আবূ লুবাবা এবং আলী ইবনে আবী তালিব ছিলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথী. যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর (পায়ে হাঁটার) পালা এলো, তাঁরা দু'জন বললো, আমরা হেঁটে যাই আপনি সওয়ারীর উপরেই চলুন. তিনি বললেন,

((مَا أَنْتُمَا بِأَقْوَى مِنِّي وَلَا أَنَا بِأَغْنَى عَنْ الْأَجْرِ مِنْكُمَا))

অর্থাৎ, "তোমরা দু'জন আমার চেয়ে বেশী শক্তিশালী নও এবং আমি তোমাদের দু'জনের থেকে নেকীর মুখাপেক্ষী কম নই." (আহমদ ৩৮৯১) একদা উসাই ইবনে হুযায়ের যখন সাথীদের সাথে ঠাট্টা করছিলেন এবং তাদেরকে হাসাচ্ছিলেন, তিনি ﷺ একটি ছড়ি দিয়ে তাঁর কোমরে খোঁচা দিলেন. তখন উসায়েদ বললেন, আপনি আমাকে ব্যথা দিয়েছেন. এখন আমাকে আপনার থেকে বদলা নিতে দিন! তিনি ﷺ বললেন, ঠিক আছে বদলা নাও. উসায়েদ বললেন, আপনার গায়ে জামা রয়েছে, আমার গায়ে জামা ছিলো না. তখন নবী করীম ﷺ তাঁর জামাটা (পিঠ) থেকে উঠিয়ে নিলেন. তখন উসায়েদ রাসূলুল্লাহ ﷺকে জড়িয়ে ধরে তাঁর কোমর ও পাঁজরের মাঝখানে চুমা দিতে লাগলেন এবং বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি এটাই চাচ্ছিলাম. (আবূ দাউদ ৫২২৪, হাদীসটি সহীহ. দ্রষ্টব্যঃ সুনানে আবূ দাউদ আলবানীঃ ৫২২৪) তিনি ﷺ মানুষের মাঝে সুবিচার প্রতিষ্ঠিত রাখার তাগিদে পূত-পবিত্র মহান আল্লাহ কর্তৃক দন্ড-বিধি পরিহার করতে পছন্দ

করতেন না, যদিও অপরাধী তাঁর কোন আত্মীয় ও প্রিয়জন হতো. তাই তো মাখযুমী গোত্রের মহিলার চুরির ঘটনায় উসামার সুপারিশ গ্রহণ করেননি. এ ব্যাপারে তাঁর প্রসিদ্ধ উক্তি হলো,

((أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الحَدَّ وَايْمُ اللهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا))

অর্থাৎ, "হে লোক সকল! তোমাদের পূর্বের লোকেরা এই জন্য ধ্বংস হয়ে গেছে যে, যখন তাদের মধ্যে কোন সম্মানিত ব্যক্তি চুরি করতো, তখন তাঁকে ছেড়ে দিতো. (তার উপর আল্লাহর দন্ড-বিধি কায়েম করতো না) আর যখন কোন দুর্বল ব্যক্তি চুরি করতো, তখন তার উপর দন্ড-বিধি কায়েম করতো. আল্লাহর শপথ! যদি মুহাম্মাদের বেটি ফাতিমা চুরি করতো, তাহলে আমি তাঁর হাতও কর্তন করে দিতাম." (বুখারী ৩৪৭৫-মুসলিম ১৬৮৮)

মুহাম্মাদ ﷺ সম্পর্কে মন্তব্য

নিম্নে কোন কোন দার্শনিকের ও পাশ্চাত্যের প্রাচ্যজাগতিক ভাষা ও ধর্মীয় পন্ডিতদের নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) সম্পর্কে কথিত বক্তব্য থেকে কতিপয় বক্তব্য তুলে ধরা হচ্ছে, এতে তাঁরা কোন পক্ষপাতিত্ব ও ইসলামের শত্রুদের প্রচার করা অসত্য উক্তির দ্বারা বিভ্রান্ত না হয়ে এই মহান নবীর মাহাত্ম্য, তাঁর নবুওয়াত, তাঁর প্রশংসনীয় গুণ এবং তাঁর আনীত দ্বীনের সততার স্বীকারুক্তি পরিষ্কারভাবে পেশ করেছেন.

ব্রিটেনের বার্নার্ডশো (Bernard Shaw) তার রচিত বই 'মুহাম্মাদ'এ লিখেছেন, (যে বইটা ব্রিটিশ সরকার জ্বালিয়ে দিয়েছে) বিশ্বের মুহাম্মাদের মত একজন চিন্তাবিদের অতীব প্রয়োজন. এই নবী তাঁর দ্বীনকে বড় সম্মান ও শ্রদ্ধার স্থানে রেখেছেন. কারণ, ইসলামই এমন বৃহত্তর ধর্ম, যা সকল সভ্যতার চিরকালীন পরিবর্তন এনেছে. আমি আমার জাতির অনেককে দেখেছি যে, তারা জ্ঞানের আলোকে এই দ্বীনে প্রবেশ করেছে. আর এই দ্বীন ইউরোপ মহাদেশে বড় বিস্তার লাভ করবে. তিনি বলেন, মধ্য যুগের ধর্মের পন্ডিতরা মুর্খতা অথবা পক্ষপাতিত্বের বশবর্তী হয়ে মুহাম্মাদের দ্বীনকে কু-শ্রীরূপে চিত্রিত করেছে. তারা তাঁকে খ্রীষ্টধর্মের শত্রু মনে করতো. কিন্তু আমি এই ব্যক্তি সম্পর্কে পড়ে বড় বিস্ময়কর ও অলৌকিক জিনিস পেয়েছি এবং এই পরিণামে পৌঁচেছি যে, তিনি খ্রীষ্টধর্মের শত্রু ছিলেন না, বরং তাঁকে মানবতার মুক্তিদাতা আখ্যা দেওয়া আবশ্যক. আর আমার মতে তিনি যদি আজ বিশ্বের নেতৃত্ব দিতেন, তাহলে আমাদের সমূহ সমস্যার সমাধান হয়ে যেতো এবং সেই শান্তি ও সৌহার্দ্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে যেতো, যার প্রতি মানুষ ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রয়েছে.

স্কটলেন্ডের নভেল পুরস্কার লাভকারী টমাস কারলাইল (Thomas Carlyle) তার কিতাব 'বীর'এ বলেছেন, বর্তমান যুগের প্রত্যেক মানুষের সব চেয়ে বড় দোষ হলো এই কথার প্রতি কান দেওয়া যে, ইসলাম একটি মিথ্যা ধর্ম এবং মুহাম্মাদ একজন প্রতারক ও মিথ্যুক. আমাদের জন্য অত্যাবশ্যক হলো, এই ধরনের অসংগত ও লজ্জাকর কথাসমূহের প্রচার-প্রসারের বিরুদ্ধে রোখে দাঁড়ানো. কারণ, এই রাসূল যে বার্তা ও পায়গাম পেশ করেছেন, তা প্রায় কুড়ি

কোটি মানুষের জন্য ১২ শতাব্দি কাল ধরে উজ্জ্বল প্রদীপ হয়ে রয়েছে. (তবে এ হিসাব নবূওয়াত প্রাপ্তির পর থেকে টমাসের বই লেখার যুগ পর্যন্ত) তোমাদের কেউ কি মনে করতে পারে যে, এই পয়গম্বরের বার্তা ও পায়গাম যার উপর অসংখ্য মানুষ জীবন-যাপন করলো ও মৃত্যুবরণ করলো, তা মিথ্যা ও প্রতারণা?

হিন্দু দার্শনিক রামকৃষ্ণ রাও লিখেছেন, মুহাম্মাদের আবির্ভাবের সময় আরব দ্বীপ উল্লেখযোগ্য কিছুই ছিলো না. এই মরুভূমি থেকে যেখানে উল্লেখযোগ্য কিছুই ছিলো না, মুহাম্মাদ তাঁর মহান আত্মার দ্বারা সমর্থ হয়েছেন নতুন বিশ্ব, নতুন জীবন, নতুন সংস্কৃতি, নতুন সভ্যতা এবং এমন নতুন দেশ গঠন করতে, যা মারাকেশ (মরক্কো একটি শহর) থেকে ভারত উপ-মহাদেশ পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছে এবং এশিয়া, আফ্রিকা এবং ইউরোপের মত তিনটে মহাদেশের জীবন ধারা ও চিন্তা-চেতনায় প্রভাব সৃষ্টি করতেও সক্ষম হয়েছেন.

কানাডার প্রাচ্যজাগতিক ভাষা ও ধর্মের পন্ডিত জুয়েমার (Zweimer) বলেন, মুহাম্মাদ নিঃসন্দেহে সর্বাপেক্ষা মহান ধর্ম-নেতা ছিলেন. তাঁর ব্যাপারেই এ কথা যথাযথ যে, তিনি সমর্থ-সক্ষম সংস্কারক, শুদ্ধভাষী ও বাক্যালাপে পারদর্শী, নির্ভীক বীর এবং মহান চিন্তাবিদ ছিলেন. তাঁকে (উল্লিখিত) এই গুণগুলোর পরিপন্থী গুণে আখ্যায়িত করা বৈধ নয়. তাঁর আনীত এই কুরআন এবং তাঁর ইতিহাস এই দাবীর সত্যতার সাক্ষ্য দেয়.

জনাব উইলিয়াম মুয়ার (William Muir) বলেছেন, মুসলিমদের নবী মুহাম্মাদ তাঁর দেশবাসীর ঐক্যমতে শিশুকাল থেকেই স্বীয় উচ্চ নৈতিকতা ও উত্তম ব্যবহারের কারণে 'আল-আমীন' (আমানতদার) উপাধি লাভ করেছিলেন. সেখানে (তাঁর সাথে) যা

কিছু হয়ে থাকুক না কেন, তিনি বর্ণনাকারীর বর্ণনার অনেক ঊর্ধ্বে. তাঁর ব্যাপারে অজ্ঞ ব্যক্তি তাঁর সম্মান বুঝতে পারবে না. আর তাঁর ব্যাপারে অভিজ্ঞ ব্যক্তি তাঁর সেই গৌরবময় ইতিহাসের প্রতি গভীর দৃষ্টিপাত করেন, যে ইতিহাস মুহাম্মাদকে বিশ্বের নবীদের মধ্যে এবং চিন্তাবিদদের মধ্যে শীর্ষস্থান দান করেছে. তিনি বলেন, এটাও মুহাম্মাদের পৃথক এক বৈশিষ্ট্য যে, তাঁর বাক্য শুদ্ধ-পরিষ্কার এবং তাঁর দ্বীন সহজ. তিনি এমন কর্মসমূহ সম্পাদন করেছেন যে বিবেক-বুদ্ধিকে বিস্মিত করে দেয়. ইতিহাস এমন সংস্কারককে জানতে সক্ষম হয় নি, যে ঐভাবে মানুষের মাঝে জাগরণ আনতে পেরেছে, সচ্চরিত্রতাকে জীবিত করতে পেরেছে এবং সংক্ষিপ্ত সময়ে নৈতিকতার মান সমুন্নত করতে পেরেছে, যেভাবে ইসলামের নবী মুহাম্মাদ পেরেছেন.

রাশিয়ার মহান ঔপন্যাসিক ও দার্শনিক লিও টোল্সটয় (Leo Tolstoy) বলেছেন, মুহাম্মাদের গৌরবের জন্য এটাই যথেষ্ট যে, তিনি জঘন্য নিষ্ঠুর জাতিকে শয়তানের নিকৃষ্টতম কু-অভ্যাস ও কু-কর্মের পাঞ্জা থেকে মুক্ত করেছেন এবং তাদের সামনে উন্নতি ও অগ্রগতির পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছেন. অবশ্যই মুহাম্মদের শরীয়ত সারা পৃথিবীতে ছেয়ে যাবে, কারণ তা জ্ঞান ও যুক্তির সাথে সুসামঞ্জস্যপূর্ণ.

অস্ট্রিয়া (Austria) বলেন, মানবতা মুহাম্মাদের মত একজন মানুষের সাথে সম্পর্কিত হয়ে গর্ববোধ করে. কারণ, তিনি নিরক্ষর হওয়া সত্ত্বেও প্রায় ১৪ শতাব্দির পূর্বে এমন বিধি-বিধান নিয়ে এসেছেন যে, আমরা ইউরোপীয়রা সর্বাধিক ভাগ্যবান হতে পারবো, যদি আমরা তার শীর্ষে পৌঁছতে পারি.

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়
৩	নবী আগমনের পূর্বে আরবের অবস্থা
৪	ইবনুযযাবিহাঈন
৭	রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দুধ পান
৯	তাঁর বক্ষ বিদারণ
১২	কা'বা গৃহ পুনঃনির্মাণ
১৩	ন্যায়-নিষ্ঠার প্রতিজ্ঞা
১৪	নবুওয়াত লাভ
১৭	প্রকাশ্য দাওয়াত
২০	আমীর হামযা ﷺ-এর ইসলাম গ্রহণ
২০	উমার ﷺ-এর ইসলাম গ্রহণ
২৪	মুশরিকদের নবী ﷺকে প্রলোভনে ফেলার প্রচেষ্টা
২৭	হাবশার দিকে হিজরত
৩১	দুঃখের বছর
৩২	দাওয়াতের বাধা দেওয়ার মুশরিকদের বিভিন্ন ধারা
৩৫	রাসূলুল্লাহ ﷺ তায়েফে
৩৬	চন্দ্র দু'টুকরো হওয়া
৩৭	ইসরা-মিরাজ
৩৯	মদীনার দিকে হিজরত
৪৩	রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনায়
৪৪	বদরের যুদ্ধ
৪৬	নবী করীম ﷺকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র
৫০	ওহুদের যুদ্ধ
৫১	খন্দক বা পরীখা যুদ্ধ

৫২	হুদায়বিয়ার সন্ধি
৫৬	মক্কা বিজয়
৫৭	প্রতিনিধি দলের আগন এবং রাজাদের নিকট পত্র প্রেরণ
৫৮	রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মৃত্যু
৫৯	নবী করীম ﷺ-এর প্রতি সাহাবীদের ভালোবাসা
৬০	অমুসলিমদের সাথে নবী করীম ﷺ-এর আচরণ
৬৩	মু'মিনরা পরস্পরের ভাই
৬৫	নবী করীম ﷺ-এর সৃষ্টিগত গুণ
৬৬	রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চরিত্র
৬৮	তাঁর কতিপয় মু'জেযা
৭০	রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবনী থেকে সংগৃহীত উপদেশাবলী
৭২	ছোটদের সাথে তাঁর আচরণ
৭৪	স্বীয় পরিবারবর্গের সাথে তাঁর আচরণ
৭৫	তাঁর দয়া-দাক্ষিণ্য
৭৬	তাঁর ﷺ সহিষ্ণুতা
৮১	তাঁর ইবাদত
৮৩	তাঁর বিষয়-বিতৃষ্ণা
৮৫	তাঁর আহার ও পরিধান
৮৬	তাঁর সুবিচার
৮৮	তাঁর সম্পর্কে মন্তব্য